

মৈত্রী সংযোগ সোসাইটি, কোচবিহার কর্তৃক রূপান্তরকাম, যৌনতা ও অধিকার বিষয়ক উত্তরবঙ্গের প্রথম পত্রিকা উদ্যোগ

মৈত্রী বার্তা

তৃতীয় সংখ্যা | ২০১৭

আসলে আমার এই সুরক্ষা বিষয়গুলো মাথায় এলে অনেক গুলো সুরক্ষার সাধ পেতে ইচ্ছে করে। একজন মানুষ হিসেবে স্বাধীন ভাবে নিজের মত থাকবার সুরক্ষা। আইনি সুরক্ষা। কর্ম জগতে নিরুদ্রবে কাজ করার সুরক্ষা.. হয়ত এর অনেকটাই স্বপ্ন কিন্তু স্বপ্ন শেষদিন পর্যন্ত থেকেই যায়.. স্বপ্ন দেখি আমার যে বন্ধুটি কাপড়ের দোকানে কাজ করে সে মেয়েলি বলে দোকানে কেউ বিদ্রূপ করবে না। আমার যে বন্ধুটি স্কুল কলেজে পড়তে যায় সে এসে বলবে না যে আমি আর পড়তে যাব না আমাকে সবাই লেডিস বলে ডাকে - হয়ত অনেকটাই স্বপ্ন। কেউ বলবে না, আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে আমার থাকবার জায়গা নেই।

একটি বিল এবং একটি আইন সব কিছু সুরক্ষা দিতে পারে না, যতদিন না সমাজের ভাবধারা পরিবর্তন হচ্ছে যে মানুষগুলো ছোট থেকে নানা অসুরক্ষিত পরিবেশে বড় হয়েছে এবং বড় হয়ে যে নানা অসুরক্ষাতে দিন যাপন করছে তাদের সাথে একটি বিল একটি আইন এবং ৩৭৭ ধারা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। যাদের মাথায় ছাদ নেই, পেটে খাবার নেই তাদের কাছে এই

সম্পাদকীয় | অরিন্দম দাস (ওরফে সুমি)

প্রসঙ্গ সামাজিক সুরক্ষা

অধিকার এর কথাগুলো খুব বেমানান শোনায়। খুব মনে পরে কিছু দিন আগে যখন ৩৭৭ ধারা নিয়ে প্রচুর হইচই হলো সেই সময় আমাদের যে বন্ধুটি সারাদিন দোকানে কাজ করে এবং যে বন্ধুটি মেয়ে সেজে মেলাতে লটারির দোকানে কাজ করে তাদের জীবনে কিন্তু এই ৩৭৭ ধারার জোয়ার-ভাটার কোনো প্রভাবই পরেনি। শেষ কথা, প্রান্তিক লিঙ্গ এবং যৌনতার মানুষ যারা তাদের যৌন পরিচয় এর জন্য তাদের নিজের স্বভাব জন্ম নানা কর্মজগত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত তাদের জন্য নতুন কর্মের উদ্যোগ নিয়ে টানাপোড়েন এর জন্ম। টানাপোড়েন একটি রূপান্তরকামী মানুষ এবং প্রান্তিক লিঙ্গের মানুষদের স্বার্থে তৈরী স্বনির্ভর দল। কোচবিহার জেলার রূপান্তরকামী মানুষদের শীতল পাটির তৈরী নানা রকম সামগ্রী এর কর্মশালা ব্যবস্থা এবং তার একটি বিশাল পরিসর তৈরী করবার লক্ষ্য নিয়ে টানাপোড়েন এগোচ্ছে। আমরা যারা গতানুগতিক কাজ এর বাইরে বেরিয়ে একটু অন্য রকম ভাবে ভাবছি আমরা আপনাদের পাশে চাই আমাদের এই উদ্দেশ্যে কে বাস্তবায়িত করবার লক্ষ্যে।

প্রতিবন্ধকতায়ুক্ত ব্যক্তিদের জন্য ‘নতুন’ আইন | শম্পা সেনগুপ্ত

সূচনা আমরা যারা প্রতিবন্ধকতায়ুক্ত মানুষদের নিয়ে কাজকর্ম, ভাবনাচিন্তা করি, আমাদের কাছে এই মুহূর্তটি একটি কালের সন্ধিক্ষণ হিসাবে দেখা দিয়েছে। ভারতবর্ষের প্রতিবন্ধী মানুষের ইতিহাসে এই সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সন্ধিক্ষণ আহ্বান জানাচ্ছে ১৯৯৫-এর পুরনো প্রতিবন্ধী আইন বাতিল করে নতুন আইন প্রণয়নের। এই নতুন আইনের দাবী আমরা প্রথম তুলেছি ২০০৯ সালের শেষ দিকে। সেই দাবীর স্বরূপ এখন আমাদের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, একটি খসড়া হিসাবে - সমগ্র প্রতিবন্ধী মানুষের আজ এক হওয়ার সময় এসেছে এই খসড়াটিকে আইনরূপে দেখার জন্য।

কেন নতুন আইন ? ১৯৯৫ সালে যে প্রতিবন্ধী আইনটি পাশ হয় সেটি যে ত্রুটিপূর্ণ তা বুঝতে প্রতিবন্ধী আন্দোলনের কর্মীদের এমনকি সরকারি আধিকারিকদেরও বেশি সময় লাগেনি। কাজেই বছর ৬-৭ ঘুরতে না ঘুরতেই যখনই নির্বাচনের পর নতুন মন্ত্রীসভা গঠন হয়, তখন দেখা যায় ১৯৯৫ -এর আইনের এক সংশোধনী খসড়া প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়েছে। অথচ এইসব খসড়া কখনোই চূড়ান্ত স্বীকৃতি পায় না, কারণ কোন দিনই সরকার বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে ভাবেনি। এইভাবে একবার নয়, দুইবার নয়, বার তিনেক আমরা দেখেছি এইটিই ‘চূড়ান্ত খসড়া’ এই দাবী দেশের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন দপ্তরকে। ইতিমধ্যে ২০০৭ সালে ভারত সরকার রাষ্ট্রসংঘে গৃহীত প্রতিবন্ধকতায়ুক্ত মানুষদের জন্য অধিকারের সনদ (UNCRPD)-এ সই করে। কাজেই ভারত সরকারের ওপর দায় বর্তায় দেশের সব আইনগুলিকে UNCRPD-র সঙ্গে সাযুজ্য রেখে তৈরি করার। পুরনো আইনটিতে অন্তত ৫০০টি সংশোধনী আনলেও সরকারি মহল একসময় বুঝতে পারে যে ১৯৯৫-এর আইন কখনোই ইউ এন সি আর পি ডি’র সাযুজ্য অনুযায়ী হতে পারে না। এর কারণ দুটির ভিত্তি একদম আলাদা। Charity-base কে Rights-base-এ পরিণত করতে গেলে শুধু কাটাছেঁড়া করলে চলবে না। আনতে হবে নতুন আইন। প্রতিবন্ধী আন্দোলনের দাবী মেনে নিয়ে তাই ২০১০ সালে তৎকালীন মন্ত্রী মুকুল বাসনিক। ডঃ সুধা কল-এর নেতৃত্বে এক কমিটি গঠন করেন নতুন আইনের খসড়া তৈরির উদ্দেশ্যে। ডঃ সুধা কল কমিটি তার খসড়া পেশ করার পর, NALSAR-এর পক্ষ থেকে আরো একটি খসড়া তৈরি হয়। এরও পরে শ্রীমতি সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে যে National Advisory Committee (NAC) আছে, সেই NAC-এর কাছ থেকে কিছু সুপারিশ পাওয়া যায়। সর্বশেষে সমাজ উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়ন দপ্তর তারা যে খসড়াটি অনুমোদন করেছেন সেই খসড়া ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেন। এরও পরে ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে মন্ত্রীসভা এই আইনটি গ্রহণ করেন এবং দেশ জুড়ে দাবী ওঠে এই আইনকে এখনই পার্লামেন্টে পেশ করার জন্য।

কী আছে এই আইনে ? অনেকেই প্রশ্ন করেছেন কি এমন নতুন কথা আছে এই আইনে আর কেনই বা আমরা এটি প্রণয়নে এত জোর দিচ্ছি। এখানে বলে রাখা ভালো যে, এই আইনটি বেশ দীর্ঘ এবং সবগুলি অনুচ্ছেদ ছোট করে বলা খুবই মুশকিলের। আমরা এখানে তবু আইনের কিছু বিশেষ দিক তুলে ধরছি।

প্রথমত: আমাদের পুরনো আইনে মাত্র ৭টি ধরনের প্রতিবন্ধকতা অন্তর্ভুক্ত আছে। নতুন আইনে বলা হয়েছে ১৮ ধরনের প্রতিবন্ধকতার কথা। যেগুলি হল - (১) অটিজম (২) দৃষ্টিহীনতা (৩) ক্রনিক নার্ভজনিত সমস্যা (৪) বধির-অন্ধতা (৫) হিমোফিলিয়া (৬) সেরিব্রাল পলসি (৭) বধিরতা (৮) মানসিক অনগ্রসরতা (৯) কুষ্ঠ

নিরাময়ক ব্যক্তির (১০) চলৎশক্তি জনিত (১১) ক্ষীণ দৃষ্টি (১২) মানসিক অসুস্থতা (১৩) মাস্কুলার ডিসট্রফি (১৪) মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস (১৫) শিক্ষণমূলক প্রতিবন্ধকতা (১৬) কথা বলার অসুবিধা (১৭) থ্যালাসেমিয়া (১৮) একাধিক প্রতিবন্ধকতা।

- এই আইনে প্রতিবন্ধীদের পুরনো আইন যেভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে বা চাকুরিতে ৩ শতাংশ সংরক্ষণের কথা বলতো, তা বাড়িয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে।
- পুরনো আইনে সেই আইন না মানলে কোনো রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথা ছিল না, এখানে শাস্তির কথা বলা হয়েছে।
- এই আইনে প্রতিবন্ধী মানুষদের অপমান করে কথা বললে (Hate speech) এর উপরেও শাস্তির কথা বলা হয়েছে।
- এই আইনে (যা পুরনো আইনে ছিল না) প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য আলাদা পরিচ্ছদ আছে।
- প্রতিবন্ধকতায়ুক্ত মেয়েদের ও নারীদের অত্যাচার থেকে সুরক্ষা দিতে একটি পরিচ্ছদ যুক্ত হয়েছে এই আইনে।
- সমাজের মূলস্রোতে প্রতিবন্ধীদের বসবাসের অধিকারের কথা বলেছে এই আইনে।
- প্রতিবন্ধী মানুষদের রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দিয়ে এই আইন একটি পরিচ্ছদ অন্তর্ভুক্ত করেছে।
- খুবই প্রয়োজনীয়ভাবে, প্রতিবন্ধীদের সামাজিক সুরক্ষার কথা বলেছে এই আইন। প্রতিবন্ধী যেসব মানুষ গৃহহীন এবং পথে থাকেন, তাদের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে এই কথা বলেছে নতুন আইন। শুধুমাত্র বসবাসের স্থায়ী ঠিকানা না থাকার জন্য যেসব প্রতিবন্ধী মানুষ এতবছর সরকারি সবরকম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত, এই ধারা নিশ্চয়ই সেইসব মানুষদের কাছে নতুন আশা বহন করে আনে।

তবে কী নতুন আইন ক্রটিমুক্ত ? একথা বলা একটু কঠিন যে, এই আইন প্রতিবন্ধী আন্দোলনের সব কটি দাবীকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখনো রয়েছে অনেক ক্ষোভ। বেশ কিছু মানুষ মনে করছেন যে, এই আইন ‘Full Legal Capacity’ না দিয়ে ‘Supported decision making’ কে মান্যতা দিয়েছে বা UNCRPD র সঙ্গে বিভেদ সৃষ্টি করে। তার মানে হল মানসিক ভাবে প্রতিবন্ধী মানুষরা তাদের জীবনের সব ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে এই আইন পাশ হওয়ার পরেও নির্ভরশীল থাকবেন পরিবার অথবা অভিভাবকদের ওপর। অন্যদিকে সরকারি কর্মীরা দাবী করছেন যে ‘প্রোমোশন’ বা চাকুরী ক্ষেত্রে উন্নতিতে সংরক্ষণ না থাকাটা এই আইনের এক বড় গাফিলতি।

শেষ কথা আমরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনী এবং NPRD-র পক্ষ থেকে মনে করি এই খসড়া শেষ কথা নয়। কিন্তু এই খসড়াটি পার্লামেন্টে পেশ করে তা নিয়ে আলোচনা করা হোক। শুধুমাত্র প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন গোষ্ঠী বা দলের মধ্যে এই আলোচনা এবং বিতর্ক সীমাবদ্ধ না রেখে ছড়িয়ে দেওয়া হোক আরও বড় আঙিনায়। আমাদের মতামত, আমাদের উদ্বেগ সবই আমরা জানাতে চাই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে, তাদের প্রতিনিধিদের। তারা যদি এই চর্চায় যোগ না দেন তাহলে ১৯৯৫ এর আইনটি যেমন সকলের অজানা থেকে গেছে, এটিও তাই থাকবে। কারণ আইন তৈরি নিয়ে আমরা (Civil Society) বা Activist-রা যতই আলোচনা করি না কেন, আইনের প্রয়োগ কিন্তু সম্ভব হবে রাজনীতিবিদদের দ্বারাই।

লেখিকা প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার ও লিঙ্গ চেতনা বিষয়ে আন্দোলন কর্মী

মালতিবালা | চয়ন রায়

তেপান্তরের মাঠ তখন চৈত্রের আঙনে পুড়ছে। জিভ বেরিয়ে আসছে গরু ছাগলের। বারান্দার উনুনে হাড়িতে ফুটে যাচ্ছে ভাত। উঠোনের গনগনে শুকনো মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে মালতি। নাক, মুখ থেকে ঝরতে থাকা রক্ত সাহারার মতো শুষে নিচ্ছে গরম উঠোন। মালতির রক্ত শুষে নেয় মাটি, বুকের দুধ শুষে নেয় সন্তান, গতর থেকে হাড়মজ্জা শুষে নেয় স্বামী। মালতির যন্ত্রণা শুষে নেয়নি কেউ, নেয়না, নেবে না। ভাতারের বেঁধে দেওয়া সময় মতো রান্না করে ভাত দিতে না পারার জন্য মালতির উপর সমাজ স্বীকৃত এই অত্যাচার। জন্ম থেকেই সে নুলো, দু পা হাঁটু থেকে পেছন দিকে বাঁকা। দু হাত কনুই থেকে সামনের দিকে বাঁকা। হাতের পাতা, পায়ের পাতা যেন আধফোটা ফুল, বিকশিত না হয়ে আটকে আছে একই জায়গায়। সময় মালতিকে বুঝিয়েছে একে মেয়ে মানুষ তার উপর বাঁকাচোরা শরীর নিয়ে জন্মানো এই বিষাক্ত সমাজে কতো বড় অপরাধ।

বাপ, মা মরার আগে তার জন্য যেটুকু জমি রেখে গিয়েছিল তার লোভে অলোক একদিন বিয়ে করলো মালতিকে। যে বিকলাঙ্গ শরীর শহরের গরম পিচে ফেলে রাখলে দিনে পঁচিশ, পঞ্চাশ টাকা আয় আছে করুনার দানে, এই প্রথম সমাজ, পেনিসতন্ত্র সিদ্ধান্তে পৌঁছাল যে কিভূত এই প্রাণীর মাংস খাওয়ার যোগ্য, বেচার যোগ্য। ‘দিকে দিকে এই বার্তা রটে গেল ক্রমে’ মালতির শরীর সক্ষম পুরুষ গমনে। তাকে যারা জন্মাতে দেখেছে, সে দেখেছে যাদের জন্মাতে, পাড়া বে- পাড়ার যারা এতদিন ছিল দাদা, ভাই, বাবা, জেঠু, কাকা তাদের নজর বদলালো। অলোক বাড়ি থাকে না, সকাল সন্ধ্যা ভাদ্রমাসের কুকুরের আনাগোনা বাড়ে। মালতিদি আমার অস্তোরটা একবার ব্যাভার করে দেখ - যতো লজ্জা মেয়ের মালতি চাপা গলায় চিৎকার করে খানকির ছাবাল সেদিন তোদের হোতি দেখিছি খেজুরের বিচির মতো। বাঁড়া নে পাড়ায় পাড়ায় নেংটো ছয়ে ঘুরে বেড়াতিস, এখন অস্তোর দেখাতি আয়হিস। তোর মাকে দেখাবি যা শুয়ারের বাচ্চা। হা হা ছেলে হাসে মালতির মাই টিপে দেয় জোরে। সমাজকে মালতি যতোটুকু চেনে, তাতে জানে মেয়ে মানুষের হৃৎপিণ্ড বুকে থাকেনা, থাকে যৌনাস্ঙ্গে। তাই হাজার যোনি ছুঁয়ে আসা ধোনের শেয়ার বাজার যতটা বাড়ে, এতের অধিক ধোনের ছোঁয়ায় যোনির শেয়ার বাজার ততোটাই কমে। ডাঙায় লাফাতে থাকা অসহায় মাছের মতো করতে থাকে সে। লজ্জায়, ঘৃনায়, ভয়ে লাল হয়ে যায় - এবার চঁচাবো বলো, দূর হ, দূর হ সেগোর বানচোদ। ছেলে হাসে, মজা পায়, প্যান্ট খুলে দেখায়। বলতে বলতে পালায়- খুঁড়িচুদি তোকে চুদি। এমনই সে মাঝে মাঝে আসে। ‘মেঘে ঢাকা তারা’র নীতা বলেছিল ‘দাদা আমি বাঁচতে চাই’, বাঁচতে চাওয়ার সে আকুতি, আর্তনাদ আছড়ে পড়েছিল চারপাশের টিলা, পাহাড়ের বুকে আর ধ্বনি প্রতিধ্বনি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে মিলেমিশে গিয়েছিল আকাশে বাতাসে, কিন্তু মালতি পারে না। সমাজ সে স্বাধীনতা তাকে দেয়নি। সেদিনও চিৎকার করে কিছু বলতে পারেনি - যেদিন তার যৌনাস্ঙ্গে ওষুধ ঢুকিয়ে দিল, মুখ হাঁ করিয়ে পুরে দিল খাওয়ার ওষুধ, মুখ চেপে রাখল অলোক। যাতে সে গিলতে বাধ্য হয়। সে জানত গর্ভপাত করাতে হলে অন্তত পক্ষে বাঁচুক মরুক গ্রামের অশিক্ষিত হাতুড়ের প্রয়োজন আছে। কিন্তু এমন নৃশংস, ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সে মানতে পারে না। আতঙ্কে তার চোখ বেরিয়ে আসে। অলোকের পা ধরে কাঁদতে থাকে সে, সে মা। গর্ভপাতের সময় পেরিয়ে আসা বাচ্চাদের হঠাৎ কেন মেরে ফেলতে হবে সে বুঝতে পারে না - নাড়ের ছাবাল তোর ওষুধ আমি মুতে বার করে দেবো। যেইনা বলা অমনি তার ঠাং দুটো ধরে উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে অলোক। যত থিস্তি দেয়, যত গলাকাটা মুরগির মতো ছটফট করতে থাকে, তত তার ঘাড়ে, পিঠে মাথায় দড়াম দড়াম লাথি কষায় অলোক।

লিঙ্গনির্মান | সঞ্জয়কুমার গায়েন

এমনিতে মানবাধিকারের জন্য লিঙ্গনির্মানের তেমন কোন প্রয়োজন পড়ত না। কেন না মানুষের মেধা, সৃজনশীলতা, কৃষ্টি, সৃষ্টি কোনকিছুই তো লিঙ্গনির্ভর নয়। তবু মানবসভ্যতায় লিঙ্গনির্মান করতে হল। আর তার কারণ মানুষ যৌনজীবী। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনে যৌনতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সেই যৌনতার বা যৌন আচরণের কারণে লিঙ্গনির্মান করা হয়েছে। বলা বাহুল্য সেই নির্মান কিন্তু মানুষ জন্মাবার পরই করা হয়। সদ্যজাত অবস্থায়। আর মুশকিলটা হয় এই কারণেই। যে উদ্দেশ্যে এই লিঙ্গনির্মান তা জন্মক্ষণে নির্মিত হওয়ার ফলে অনেকসময় তা ফলপ্রসূ হয় না। বয়ঃসন্ধির গভিপেরিয়ে মানুষ যখন তার যৌবনের আকাশে ডানা মেলতে যায় তখন অনেকেই অনুভব করে, আশৈশব তাকে যে যৌনচেতনার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা ভীষণ রকমের ভুল শিক্ষা। কারণ তাকে সেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তার শারীরিক যৌনাঙ্গ দেখে। কিন্তু মানুষের যৌনতাবোধ তো যৌনাঙ্গ থেকে আসে না। আসে মস্তিষ্ক থেকে। সেই মস্তিষ্ক (কেউ কেউ এখানে মস্তিষ্ক না বলে মন বললেও অসুবিধা নেই, এইক্ষেত্রে দুটি সমার্থক। যেহেতু অ্যানাটমি শরীরে মনের অবস্থান কোথায় তা বলতে পারে নি এবং অনেকেই মস্তিষ্কের ভিতরেই মন থাকে বলে চিহ্নিত করেছে, তাই এখানে মস্তিষ্ক ও মনকে সমার্থক করে নেওয়া হয়েছে।) বলে দেয় কে কেমন যৌন আচরণ করবে। ব্যাস, যত সমস্যার সূত্রপাত হয় এখান থেকে। সমাজের বেশিরভাগের যৌন আচরণ যেহেতু শারীরিক যৌনাঙ্গের সঙ্গে সাজুস্যপূর্ণ তাই যাদের যৌন আচরণ শারীরিক যৌনাঙ্গের বিপরীত বা পৃথক তাদের যৌন আচরণকে সমাজ কিছুতেই বিশ্বাসই করতে চায় না। স্বীকৃতি দেওয়া তো অনেক পরের কথা।

যাইহোক, সমস্যাটা শুধু অবিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সেই অবিশ্বাস থেকে তাদের বাধ্য করা হয় শারীরিক যৌনাঙ্গের নিয়ম মেনে যৌন আচরণ করতে। শুধু তাই নয়, তাদের লিঙ্গনির্মানও করা হয় ওই যৌনাঙ্গ দেখে।

কিছুক্ষণের জন্য নামায় আবার উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। কেমন যেন আঁধার ঘনিয়ে আসে চারপাশে, মৃত্যুর কাছাকাছি দেখতে পায় হয়তো। তারপর তার শরীর থেকে বেরিয়ে আসে একটা মাংসের পিণ্ড, স্বামীর দ্বারা ধর্ষিতা হওয়ার ফল। জরায়ুর থোলিতে থাকে সে ধারন করে একটু একটু করে বাড়তে সাহায্য করেছে। অত্যাচারে ক্ষত-বিক্ষত শরীর নিয়েও গর্ভে অক্ষত রেখেছে যে সন্তানকে, সেই সন্তানকে পূর্ণ বিকশিত করে জন্ম দেওয়ার অধিকারও তার নেই।

জীবন চলেছে মালতির, ঘটে চলা অবিচার, অত্যাচার, নৃসংশতা তার কাছে এখন হাগা মোতার মতো স্বাভাবিক। শীত, ঝড়, বর্ষা মালতি ঘরে ঢুকতে ভয় পায়, সে হয় উঠোনে নয় পড়ে থাকে বারান্দায়। যারা কেউ কারো বাবা, কাকা, দাদু তারাও এসে মালতিকে অনেকভাবে ধরে বারান্দা থেকে ঘরে ঢোকাবার চেষ্টা করেছে। মালতি ওমনি পাঁচ-ছ ফুট উঁচু বারান্দা থেকে গড়িয়ে ঘাড় মোটকে পড়েছে উঠোনে। যতটা না ধর্ষনের হাত থেকে বাঁচার তাগিদে, তার চেয়ে বেশি হয়তো সমাজের দেওয়া হরেক রকমের উপাধির ভয়ে। নিজের শরীরই তার কাছে এক বিভীষিকার মতো মনে হয়।

অলোক মাঝে মাঝে বাইরে থাকে রাতে। পোষা মেয়ে মানুষ আছে তার, থাকতেই পারে, পুরুষ মানুষ। মাঝে মাঝে মদ খেয়ে বাড়ি ফেরে। মালতি তখন মটকা মেরে পড়ে থাকে, তবুও সে অত্যাচারের হাত গলে পালাতে পারে না। রান্না তরকারিতে ঝাল হয়েছিল বেশি, তাই গরম তরকারি ঢেলে দিয়েছিল তার মাথায়। চুলের মুঠি ধরে টেনে নামিয়েছিল উঠোনে। ঠ্যাং ধরে মাথা ডুবিয়ে দিয়েছিল পুকুরের জলে। তার জামা উল্টে গিয়ে জলে ভিজে আটকে গিয়েছিল মুখে, গোঁঙানির শব্দ এমন যেন এখনই স্তব্দ হয়ে যাবে হৃৎপিণ্ড। চুলের মুঠি ধরে ঝড়ের বেগে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ভিটের নিচে। মাঠের চষা জমির বড় বড় শুকনো ঢিলের উপর দিয়ে মাঠেই ফেলে আসে অলোক। জ্ঞান ফেরার পর চাঁদের নরম অলোর দক্ষিণা বাতাসের আদরেও তার যন্ত্রণা কমে না। সে অনুভব করে তার মাথার চামড়া সেদ্ধ হয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে একটা দাঁত। তারপর তার চিৎকার ধরিত্রীরও বুঝি মর্মে পৌঁছল। রাতের ঘুমন্ত পশুপাখিও জেগে উঠল, যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল তারা, কে জানে রাতের গাছের পাতাও বেদনায় ঝরে পড়ল কিনা! মাঠের মাঝখানে, মানব জাতির অবিচারে বন্যজন্তুর মত একলা মেয়ে জন্মদিল পুরুষ সন্তানের। নাকি আগামীর এক অত্যাচারীর, সে সময়ই বলবে।

মালতি শুধু সুন্দরবনের জল জঙ্গলের আড়ালে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যু দিনের অপেক্ষায় থাকা এক অজানা দ্বীপের বেওয়ারিশ না মানুষ কোনো নারী নয়। এ মানব সভ্যতা বিস্তৃত পৃথিবীর সবখানে তার বাস, বসবাস। মানুষ নামের প্রাণীটির সৃষ্টির ইতিহাস থেকেই সমাজ, রাষ্ট্রনামের নোংরা নিয়মের প্রসবকাল থেকেই মালতি যোনী মেলে চিতিয়ে পড়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে। সমাজে রাষ্ট্রের সম্বীলিত ব্যবহৃত সে যোনি মানব সভ্যতাকে বয়ে নিয়ে চলছে আজও। তার যন্ত্রণার, আর্তনাদের, চোখের জলের, রক্তের হাড় মজ্জার সারে উর্বর হয়েছে মানব সভ্যতার, পেনিসতন্ত্রের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত। কতো ধর্মের, কতো যুদ্ধের কতো রাষ্ট্র দখলের, কতো কাঁটাতারের, কতো সামাজিক, রাষ্ট্রিয় অস্থিরতার, কতো সভ্যতার উত্থান পতনের ইতিহাস লেখা আছে এই যোনীর দেয়ালে। অযুত নিযুত বৎসর ধরে এই যোনির ভেতর ইতিহাসের ওপর জমে চলেছে ইতিহাসের পলি। যন্ত্রণার, কান্নার, হাহাকারের এক নৃশংস ইতিহাস। যে ইতিহাসের মৃত্যু নেই।

লেখক কলকাতায় অবস্থিত

কিন্তু যাদের যৌনতা অন্যরকম তারা হাজার চেষ্টা করলেও শারীরিক যৌনাঙ্গের ন্যায় যৌন আচরণ করতে পারবে না। পারা সম্ভব নয়। তাতে সমাজ মানুষ, না মানুষ দূরে ঠেলে দিক যা ইচ্ছা করুক। একটা সহজ কথা হল, মানুষ নিজেকে ‘মানুষ’ হিসাবে চিহ্নিত করে সভ্যতা গড়ে তোলার অনেক আগে থেকেই যৌনক্রিয়া করছে এবং সেই ক্রিয়া তাদের শরীর মন যোভাবে চাইছে সেভাবেই করছে।

এমনকি মানবসভ্যতার গর্ব যে বিজ্ঞান নিয়ে, সেই বিজ্ঞানই তো বলছে মানুষের যৌনআচরণ তার শারীরিক লিঙ্গ নির্ভর নয়, তার যৌনচেতনা নির্ভর।

সকল মানুষকে স্বাধীনভাবে বাঁচতে দেওয়ার জন্যই যখন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে, তখন কেন এই প্রবঞ্চনা? যৌনতার স্বাধীনতা মানুষের কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানুষ যৌনক্রিয়া করে কেবল সন্তান উৎপাদনের জন্য নয়, তার দৈহিক ও মানসিক ক্ষুধা নিবারণের জন্যও।

আশার কথা, এত শতাব্দী পেরিয়ে আসার পর, পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের পাশে ‘তৃতীয়লিঙ্গ’ বা ‘অন্য’ লিঙ্গ নির্মান করা হয়েছে। যদিও সেখানেও শারীরিক যোগসূত্র খোঁজার প্রসঙ্গ আছে। তবুও শুরু যখন হয়েছে, ভাবা হচ্ছে, এবার বোধ হয় মানসিক যৌনচেতনার ভিত্তিতে লিঙ্গনির্মাণ করা হবে। হোক, হওয়াটা অত্যন্ত প্রয়োজন। এবং তা হোক মানুষ বয়ঃসন্ধিতে পৌছানোর পর। শৈশবে তো সবাই শিশু। তখন লিঙ্গ চেতনা থাকে না। তাই শৈশবের লিঙ্গনির্মান হোক শর্তসাপেক্ষে। আর বন্ধনীতে দেওয়া থাক বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছে যদি কেউ চায় নিজ লিঙ্গরূপের রূপান্তর করে নেবে তবে সে নতুন লিঙ্গনির্মান করে নিতে পারবে। এভাবেই গড়ে উঠুক যৌনচেতনার স্বাধীন দেশ।

সম্পাদক, অবকাশ পত্রিকা

ট্রান্সজেন্ডার বিল বৈষম্য নির্মূল করার জায়গায় সামাজিক বৈষম্যকে

আরও জোরদার করে তুলতে পারে | অনি দত্ত

নিম্নের ইন্টারভিউ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিটি রেডিও অনুষ্ঠানে গৃহীত এক সাক্ষাৎকারের প্রতিলিপি। পাঠকদের সুবিধের খাতিরে ঈষৎ পরিমার্জিত।

শম্পা সেনগুপ্ত: নমস্কার আপনারা শুনছেন কমিউনিটি রেডিও। আমি শম্পা সেনগুপ্ত, নিয়ে এসেছি নতুন একটি বিষয়, রূপান্তরকামীদের জন্য আইন। আজকে আমাদের ষ্টুডিওতে উপস্থিত আছেন অনি দত্ত। তিনি আইওয়া ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক, প্রান্তিক লিঙ্গের মানুষদের নিয়ে গবেষণা করছেন এবং কিছু বছর ধরে প্রান্তিক লিঙ্গ ও যৌনতার মানুষদের আন্দোলনের সাথে একজন গোষ্ঠী সদস্য হিসেবে যুক্ত রয়েছেন।

অনি, অনেক ধন্যবাদ আমাদের ষ্টুডিও তে আসবার জন্য। আমরা জানি আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে অনেক বছর এবং যে আইনগুলো রয়েছে, তার মধ্যে সর্বসাধারণের জন্য প্রযোজ্য আইন ছাড়াও মহিলাদের এবং কিছু প্রান্তিক গোষ্ঠীর জন্য কয়েকটি বিশেষ আইন রয়েছে। কিন্তু রূপান্তরকামীদের জন্য কোনো আইন ছিল না। এমন তো নয় যে মানুষগুলো ছিল না। কিন্তু এদের জন্য এই আইনের এখন কেন এত প্রয়োজন পড়ছে? সেটা নিয়ে যদি আমরা প্রথমে একটু কথা বলি...

অনি দত্ত : হ্যা, অবশ্যই আইনটার একটি বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত আছে। সেটা বোঝার জন্য আমাদের একটু পেছনে তাকাতে হবে। এই খসড়া আইনটি পেশ হবার আগে সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে ২০১৪ সালে একটি রায় এসেছিল। নালসা বলে যে ন্যাশনাল লিগাল সার্ভিস অথরিটি আছে, তাঁরা একটি পিটিশন ফাইল করেছিলেন যার পরিপ্রেক্ষিতে রায়টি দেওয়া হয়েছিল। সেই রায়ে অনেকগুলো কথা বলা হয়েছিল, যেমন রূপান্তরকামী ও প্রান্তিক লিঙ্গের মানুষদের লিঙ্গ স্বনির্ধারণের কথা বলা হয়েছিল। অর্থাৎ সরকারী পরিচয়পত্রে তাঁরা নিজের পছন্দ মতো লিঙ্গ বেছে নিতে পারবেন। তাছাড়াও সংরক্ষণের কথা বলা বলা হয়েছিল, অর্থাৎ সরকারী চাকরিতে রূপান্তরকামীরা প্রান্তিক লিঙ্গের মানুষদের জন্য কোটা রাখা হবে।

সুপ্রিমকোর্টের থেকে এই যে নির্দেশিকাগুলো এসেছিল, তারপর থেকেই সরকারের পক্ষ থেকে একটি প্রচেষ্টা লক্ষনীয় যে সেগুলোকে কিভাবে আইনে বাস্তবায়িত করা যায়। প্রথমদিকে তিরুচি শিভা বলে একজন সাংসদ একটি আইন পেশ করেছিলেন রাজ্যসভাতে, কিন্তু সেটা পরে লোকসভাতে আর পাঠানো হয়নি। তারপর সামাজিক ন্যায়মন্ত্রালয় একটি ড্রাফট বিল তৈরী করেন যেটা ২০১৫ সালে হাতে পাই। তারপর সেটাকে আরও পরিবর্তিত করে ২০১৬ সালে অগাস্ট মাসে লোকসভাতে পেশ করা হয়।

শম্পা সেনগুপ্ত: তাহলে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা আইনের পেছনে একটা কারণ। আমরা কি একটু বোঝার চেষ্টা করব কেন এই আইন দরকার রূপান্তরকামী মানুষদের জন্য? মানে সাধারণ মানুষ যে সুযোগ সুবিধাগুলো পাচ্ছে সেগুলো তাঁরা পাচ্ছেন না বলেই কি আলাদা আইন দরকার? এই পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলনের মানুষজনেরা কি বলছেন, সেটা যদি একটু বোঝার চেষ্টা করি?

অনি: একদম আন্দোলনের প্রসঙ্গে যাবার আগে আমরা একটু গোড়ার কথা বলে নেই। আমরা লিঙ্গ বা জেন্ডার ইত্যাদি নিয়ে তো খুব একটা আলোচনা করিনা আমাদের সমাজে। তাই একটু বোঝার দরকার যে এই রূপান্তরকামী ও প্রান্তিক লিঙ্গের মানুষরা কারা, এবং এই নামগুলো কোথা থেকে উঠে আসছে। আমাদের সমাজে আমরা ধরে থাকি যে লিঙ্গ পরিচিতি শরীর থেকে নির্গত হয়। ছোট বেলাতে আমাদের শারীরিক কিছু অঙ্গ দেখে আমাদের সমাজ একটি তকমা লাগিয়ে দেয়, যে এই ধরনের মানুষেরা ছেলে এবং আরেক ধরণের মানুষেরা মেয়ে। এবং কিছু কম সংখক মানুষদের যৌনঙ্গ দেখে বোঝা যায় না বলে তাদের অন্তলিঙ্গ বা intersex তকমা দেওয়া হয়। এবার, রূপান্তরকামী হওয়াটা কিন্তু শরীরের সাথে রিলেটেড কোনো বিষয় নয়। সামাজিক ভাবে হয়ত আমি ছেলে বা আমার যৌনঙ্গ দেখে বলে দেওয়া হল আমি ছেলে, কিন্তু আমি সেই পরিচয়ের সাথে মিল বা স্বাচ্ছন্দ বোধ করছি না। এটা কিন্তু শারীরিক পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত নয়। অনেকে তাঁদের শরীর পরিবর্তন করতে চান, অনেকে না করেই সুখী, কিন্তু সমাজের চাপানো লিঙ্গ পরিচিতি নিয়ে খুশি নন। তাঁরা সেই সামাজিক পরিচিতি থেকে বেরিয়ে নিজের সত্তা বা পছন্দ অনুযায়ী পরিচিত হতে চান। এইভাবে রূপান্তরকামী বা প্রান্তিক লিঙ্গের একটি বৃহৎ সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে। তার মধ্যে অনেক হিজড়ে গোষ্ঠীর মানুষ আসতে পারেন। তাছাড়াও আমাদের কমিউনিটিতে নানা শব্দ আছে, কোতি, মেটি, ধুরানি ইত্যাদি, মেয়েলি পুরুষ এবং পুরুষ থেকে নারী রূপান্তরকামী জন্য। এবং আরও আছে রূপান্তরকামী পুরুষ বা নারী থেকে পুরুষ রূপান্তরকামী মানুষ, অর্থাৎ যাদের শরীরের ভিত্তিতে মেয়ে বলা হচ্ছে, কিন্তু তাঁরা মেয়ে পরিচয় দিতে চান না, তারা পুরুষ বা অন্য ভিন্ন লিঙ্গ হিসেবে পরিচিত হতে চান। এই যে নানা ভিন্ন রকমের মানুষেরা আছেন, তাঁরা যখন তাঁদের উপস্থিতিটা সমাজে প্রকাশ করেন, সেটা জামা কাপড়ের মাধ্যমে হতে পারে, চুলের স্টাইলে হতে পারে, আচরণের মাধ্যমে হতে পারে, তখন তাদের কিন্তু নানা রকম বৈষম্যের মুখোমুখি হতে হয়। সেটা কিন্তু একদম ছোটবেলা থেকে শুরু হয়ে যায়। সেই সময় আমরা হয়ত পরিচিতি নিয়ে অত ভাবিও না। না ভেবেই তাঁরা যখন তাঁদের সেই অভিব্যক্তিগুলো প্রকাশ করছেন, সেই সময় থেকেই কিন্তু তাঁদের প্রতি নানা রকম হিংসা বা বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন আমরা দেখি অনেক ‘ছেলে’, ‘মেয়েলি’হলে স্কুলে সমস্যার মুখোমুখি হয়। সেই জন্য অনেক মানুষেরা স্কুল শেষ করতে পারেন না, অনেকে কলেজে পড়তে পারেন না। যদিও বা

কলেজ পাশ করেন, তাহলেও কিন্তু পরবর্তীতে মূলস্রোতের নানা কর্মক্ষেত্রে জায়গা পান না। যদি কাজ করতে চান তাঁদের অভিব্যক্তি সব লুকিয়ে রাখতে হয়।

এই সব কারণেই একটি আইনের সত্যিই প্রয়োজনীয়তা ছিল। সেই জন্য বিভিন্ন সংগঠন এবং সমাজকর্মী মানুষেরা ২০০৯-২০১০ সাল থেকেই কিন্তু সরকারের সাথে নিজেদের গোষ্ঠীর স্বপক্ষে ওকালতি চালাচ্ছেন। সুপ্রিম কোর্টের নালসা জাজমেন্টের পর তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন যাতে রাজ্যসভা ও লোকসভাতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ বাস্তবায়িত করার জন্য একটি আইন পাস করা হয়। কিন্তু তারপর আইনের যে ফাইনাল ভার্সান আমরা পেয়েছি সেটাতে কিন্তু অনেকগুলো সমস্যা রয়ে গিয়েছে। এখন আমাদের অনেকের মধ্যেই প্রশ্ন যে আইনটা এসে আমাদের আদৌ লাভ হল না ক্ষতি হল? বরং যেটা আমরা সুপ্রিমকোর্টের মাধ্যমে পেয়েছিলাম, এই ২০১৬ সালের নতুন খসড়া আইনটি এসে তার মধ্যে অনেক কিছু বানচাল করে দিয়েছে।

শম্পা সেনগুপ্ত: আচ্ছা, আমরা একটা দীর্ঘদিনের না পাওয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম, মাঝে সুপ্রিমকোর্টের নালসা জাজমেন্ট কিছুটা আলো দেখিয়েছিল, তারপর আর একটা আইন এসে সেই প্রাপ্তিটাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। আমি আইনের জায়গাতে খুব বেশি একটা যাচ্ছি না। আমরা বিরতির পর আলোচনা করব যে সাধারণ মানুষ কিন্তু আইন কি তৈরী হচ্ছে সেটা জানেন না। আমরা রোজকার জীবনে দেখছি যে কিছু মানুষ যারা ছেলে কিন্তু ছেলেদের মতো নয়, মেয়ে কিন্তু মেয়েলি নয়, তাদের আমরা কিভাবে নেব? সেই সামাজিক ভীতি বা বৈষম্যের দিকটা কি ভাবে দূর করা সম্ভব? সেটা কি কোনো আইন দিয়ে দূর করা যায়? সেটা একটা প্রশ্নে জায়গা।

ফিরে এলাম বিরতির পর, আমরা আলোচনা করছি রূপান্তরকামী আইন নিয়ে ... অনি আমরা বিরতির আগে আলোচনা করছিলাম যে সমাজে কিছু নেগেটিভ ধারণা আছে, যেমন এই মানুষগুলো ভালো নয়, এরা চুরি করে, ভিক্ষা করে, এদের আমরা একটু এড়িয়ে চলি। তো এই আইনটা কি এই ধারাগুলি কে পাল্টে দেবার ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা পালন করবে?

অনি: ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এখানেও সুপ্রিমকোর্টের রায়ের কথা একটু বলছি। সেই রায়ে যে কর্মসংস্থানের কথা হয়েছিল, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা। আমরা দেখি যে এই মানুষগুলো সমাজের মূলস্রোতে কোনো কাজ না পেয়ে বিভিন্ন রকম পেশার সাথে যুক্ত হন, বিশেষ করে পুরুষ থেকে নারী রূপান্তরকামী মানুষেরা সিগনালে টাকা তোলা, ট্রেনে টাকা তোলা বা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাচ্চা নাচানোর মতো কাজের সাথে যুক্ত থাকেন। এই পেশাগুলো বিভিন্ন দিক রয়েছে, সেগুলোতে আমি ঢুকছি না, কিন্তু এটাও সত্য যে এই পেশাগুলি ছাড়া কিন্তু এঁদের খুব একটা বিকল্প কিছু নেই। তাঁরা এই পেশা করতে চান কি না চান সেটা পরের কথা, কিন্তু তাঁরা বিকল্প পেশা মানে মেইনস্ট্রিম সমাজের বিভিন্ন পেশা যেমন দোকানে কাজ করা বা কোনো অফিসে কাজ করা, সেই রকম কিছুতে কিন্তু ঢুকতে পারেন না। আর পারলেও তাদের লিঙ্গ অভিব্যক্তি ভীষণ ভাবে লুকাতে হয়, যেহেতু সেটা না লুকিয়ে এই ধরনের কাজে থাকতে পারবেন না। সেটা কিন্তু সুপ্রিমকোর্ট বুঝতে চেয়েছিল এবং এর প্রতিকার করতে চেয়েছিল এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ও সরকারী কর্মক্ষেত্রে সংরক্ষণের কথা বলেছিল। শিক্ষাতে কেন, সেটা আমি আগেই বলেছি, যে প্রান্তিক বা ভিন্ন লিঙ্গের মানুষেরা কিন্তু স্কুল জীবনে থেকেই সমাজে বহিস্কৃত হয়ে যান, নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হন। তেমন এই কর্ম ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটাই হয়। কিন্তু নতুন আইনে সম্পূর্ণ ভাবে সংরক্ষণের কথা এড়িয়ে গিয়েছে, কিভাবে সংরক্ষণ হবে সেটাও কিছু বলেনি। এবং যদি শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য হয় সেটা কি করে দূর করা যাবে সে রকম কোনো কথাও এই নতুন আইনে বলা হয় নি, সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়েছে।

আরেকটা খুব সমস্যাজনক বিষয় হল যে আইনের সুবিধাগুলি পেতে গেলে একটি ট্রান্সজেন্ডার সার্টিফিকেট লাগবে, যেটা প্রতি জেলার একটি কমিটি যাচাই করে দেবে। সেই সার্টিফিকেটের মাধ্যমে কোনো রূপান্তরকামীরা ভিন্ন লিঙ্গের ব্যাক্তি পুলিশে এবং অন্যান্য জায়গায় কোন বৈষম্য বা অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে পারবেন। কিন্তু এই কমিউনিটির অনেক মানুষ শিক্ষিত নন। একটা সরকারী দপ্তরে গিয়ে একটা সার্টিফিকেট বের করে প্রমাণ করা যে তাঁরা রূপান্তরকামী, এই জিনিসগুলো তাদের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। সংবিধান অনুযায়ী একটি নাগরিক হিসেবে আমার লিঙ্গ নির্বিশেষে যা যা অধিকার আছে, তা পেতে গেলে আমাকে আবার একটা আলাদা সার্টিফিকেট কেন বের করতে হবে? কেন একজন নাগরিক হিসেবে আমি এই আইনের মাধ্যমে সুরক্ষিত হব না? এগুলো এই আইনের খুব সমস্যার দিক।

আরেকটা দিক হল সামাজিক লিঙ্গ নির্মাণের কথা, যেটা একটু আগে বলেছিলাম। শারীরিক কিছু চিহ্নের ভিত্তিতে আমরা একটি লিঙ্গ পরিচয় যে কোন মানুষের ওপর বসিয়ে দিই, কাউকে দেখেই আমরা বলে দিই এ ছেলে, ও মেয়ে। সেই মানুষটি সেই পরিচয়ে খুশি কিনা, সেটা আমরা জিজ্ঞেসও করি না। এই জায়গাতে কিন্তু সুপ্রিমকোর্টের নালসা রায় বলেছিল লিঙ্গ স্বনির্ধারণের কথা - আমার শরীরের যাই বৈশিষ্ট থাকুক কিনা থাকুক, তার নির্বিশেষে আমি যেন আমার পরিচয় পত্রগুলিতে নিজের লিঙ্গ পরিচয় নিজের স্বাচ্ছন্দ মতন বেছে নিতে পারি। আমি চাইলে পুরুষ, নারী, বা এই দুইয়ের থেকে বাইরে গিয়ে অন্য পরিচয় ও বাছতে পারি। এবং সেটা কিন্তু শারীরিক পরিবর্তন করা বা না করার ওপর নির্ভরশীল নয়। সমস্যাটা যে আমার

শরীরের নয়, বরং সমাজ যে পরিচয় দিচ্ছে সেটা আমাদের পরিচয়ের সাথে খাপ খাচ্ছে না, সেটা কিন্তু নালসা রায় বুঝেছিল এবং সেটা বুঝেই লিঙ্গ স্বনির্ধারণের অধিকারের স্বপক্ষে রায় দিয়েছিল।

কিন্তু এই নতুন আইন যেটা তৈরী হয়েছে, তার মধ্যে লিঙ্গ স্বনির্ধারণের অধিকারটা কোথাও গিয়ে চাপা পড়ে গিয়েছে। একটা সমস্যার দিক হচ্ছে এই যে আইনে রূপান্তরকামী পরিচয় বলতে যেটা বোঝানো হয়েছে, সেটা অনেক ক্ষেত্রেই শরীর ভিত্তিক। ট্রান্সজেন্ডার বলতে বলা হয়েছে এমন মানুষ যারা ‘বোথ মেল এন্ড ফিমেল’ বা ‘পার্ট মেল অর ফিমেল’। মেল-ফিমেল বলতে আমরা তো সাধারণত শারীরিক লিঙ্গ চিহ্নের কথাই বুঝি। তাই কোথাও গিয়ে মনে হচ্ছে যে আইনটা রূপান্তরকামী বুঝতে গিয়ে একমাত্র ইন্টারসেক্স বা অন্তর্লিঙ্গ মানুষদেরই বুঝেছে, যাদের শরীরে উভয় লিঙ্গের বৈশিষ্ঠ কোনভাবে বর্তমান। রূপান্তরকামী এবং অন্তর্লিঙ্গ কিন্তু এক জিনিস নয়। এটা সমাজের একটা বড় ভুল ধারণা যে যাদের শারীরিক বৈশিষ্ঠ দেখে ছেলে অথবা মেয়ে এই দুটো নিয়মের মধ্যে ফেলা যায় না, তারাই রূপান্তরকামী বা হিজড়ে। কিন্তু অনেক রূপান্তরকামী মানুষ কিন্তু শরীরের দিক থেকে তথাকথিত ‘পূর্ণাঙ্গ’ পুরুষ বা নারী শরীর নিয়েই জন্মেছেন। কিন্তু এটা তো শারীরিক পরিচয় নয়, এটা মানসিক পরিচয়, অতয়েব শরীরের ভিত্তিতে কিন্তু এই পরিচয়টি নির্ধারণ করা যায় না। কিন্তু এই আইনে আবার শরীরের ওপরেই লিঙ্গ পরিচয় নির্ভরশীল করা হচ্ছে। ট্রান্স সার্টিফিকেট প্রদান করার জন্যে যে জেলা ভিত্তিক কমিটির কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যেও ডাক্তার রাখার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু শারীরিক লিঙ্গ নির্ধারণের সাথে কিন্তু অনেক ধরনের সামাজিক হিংসাও যুক্ত আছে। যাঁরা সিগনালে টাকা তোলে, তাঁরা শারীরিক ভাবে ‘ছেলে’ প্রমাণিত হলে তাঁদের ওপর অনেক সময় পুলিশ অত্যাচার করে। আমরা সাধারণত মিডিয়াতে দেখি যে এরা সাধারণ মানুষের উপর জুলুম করছেন, আমরা কিন্তু কখনও শুনিনা, কেন তারা এই পেশাতে যেতে বাধ্য হচ্ছেন বা এদের ওপরকে নানা রকম অত্যাচার হচ্ছে। অনেক সময় পুলিশ এদের ট্রেন থেকে বা সিগনাল থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে জামাকাপড় খুলে দেখে যে তাঁরা ‘আসল’ না ‘নকল’ ... যদি দেখা যায় যে তাঁরা শারীরিক পরিবর্তন করেছেন বা অন্তর্লিঙ্গ, তাহলেই তাঁদের ‘আসল’ মানা হয়, যাঁদের দেখা যায় পুরুষাঙ্গ রয়েছে তাঁদের ‘নকল’ বলা হয় এবং নানা রকম অত্যাচার করা হয়। এই যে বৈষম্যটি আছে সেটা কিন্তু এই আইন শরীরের ভিত্তিতে লিঙ্গ পরিচয় নির্ধারণ করে আবার জোরালো করে তুলছে। তা ছাড়াও যে জেলার কমিটির কথা বলা হয়েছে, যার মধ্যে ডাক্তার থাকবে, মনোবিদ থাকবে, সরকারী আধিকারিক থাকবে, যারা রূপান্তরকামী হবার সার্টিফিকেট দেবে প্রশ্ন হচ্ছে যে তারা কি দেখে বা কিসের ভিত্তিতে নির্ধারণ করবে যে কে রূপান্তরকামী আর কে নয়? সেটাও কিন্তু আইনে বলা নেই। এর ফলে কি হবে, যে যার মন গড়া ভাবনা নিয়ে নির্ধারণ করবে যে কেউ আদতে রূপান্তরকামী বা প্রান্তিক লিঙ্গের মানুষ কি না। একটা কমিটির কাছে আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে আমি রূপান্তরকামী। সেটা কিন্তু আবার সেই শারীরিক লিঙ্গ নির্ধারণের সামাজিক হিংসাকে জোরালো করে তুলছে। অতয়েব দেখা যাচ্ছে যে এই আইনটি নালসা রায়তে যে লিঙ্গ স্বনির্ধারণের কথা বলা হয়েছিল, সেটা পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এখনও এই আইনটি বিল বা খসড়া অবস্থায় আছে, পরিপূর্ণ আইন হিসেবে বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু এই গোষ্ঠীদের মধ্যে অনেকের মনে হয়েছে যে এই আইনটি আমাদের খুব একটা কাজে আসবে না। আরও একটা সমস্যার দিক যে আমরা ট্রেনে

বা বাড়িতে হিজড়ে ও রূপান্তরকামী গোষ্ঠির মানুষদের যেই পেশাগুলি করতে দেখে থাকি, এই আইনে সেগুলোকে কিন্তু অপরাধ হিসেবে দেখা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে কোনও রূপান্তরকামী মানুষকে যদি জোর করে বা প্রলোভন দেখিয়ে কোনো ভিক্ষাবৃত্তির কাজে আনা হয়, সেটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অথচ কেউ কিন্তু প্রলোভনের জন্য ভিক্ষাবৃত্তিতে আসেন না, অন্য কোন বিকল্প না পেয়ে আসেন। কর্মসংস্থানের কোনও ব্যবস্থা না করে এই আইনটি কিন্তু আবার সেই অত্যাচারের একটি জায়গা তৈরী করল, যে হিজড়ে পেশায় যোগদান করার ‘প্রলোভন’ দেখানোর অপরাধে পুলিশ হিজড়ে গোষ্ঠির মানুষদের ধরে নিয়ে যেতে পারে। যদিও সাধারণত অন্য কোনো কাজ না পেয়েই সবাই এই পেশাতে আসে। তাছাড়া এই আইনে কোনও বৈষম্য বিরোধী পদক্ষেপ সুনির্দিষ্ট করে বলা হয় নি। অতয়েব বৈষম্য নির্মূল করার জায়গায় এই আইনটি আবার সামাজিক বৈষম্যকে জোরালো করে তুলতে পারে - এই আইনটি নিয়ে সেটাই আমাদের ভয়।

শম্পা সেনগুপ্ত: আমাদের আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করতে হবে, তার আগে আমি আরেকটি উত্তর চাইব। সেটা হচ্ছে, আমি যখন সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলি, তারা বলে আমরা হিজড়াদের থেকে দূরে থাকি ... আমাদের নিজেদের মনের অন্ধকার কিন্তু দূর হচ্ছে না।

কেউ রূপান্তরকামী হোক আর যাই হোক, সে তো একজন মানুষ, এর বেশি তো তার কোনও পরিচয় নেই। এটা নিয়ে কিন্তু আমরা খুব কম চিন্তা ভাবনা করছি ... আমি যদি আমাদের শ্রোতাদের কথা ভাবি, তাঁদের আমরা কি মেসেজ দিতে পারি, কোন জায়গাতে নিজেদের একটু সংবেদনশীল হতে হবে, সেটা যদি একটু বল।

অনি: আমার মনে হয় যে সামাজিক স্তরে সচেতনতা খুব দরকারী। এবং যেটা আপনি আগেও বললেন, সেটা কিন্তু কোনও আইনের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব নয়। অনেক সমাজকর্মী ও সংগঠন আছেন যারা এই বিষয়ে ওকালতি করে থাকেন, সচেতনতা মূলক কাজ করে থাকেন। কিন্তু নিজের মধ্যে যদি পরিবর্তন না আসে, সেটা তো অন্যের দ্বারা সম্ভব নয়। একটা কথা মনে রাখার খুব দরকার, যে লিঙ্গ ভিন্নতা বা রূপান্তরকামিতা এটা কিন্তু কোনো বাইরের বিষয় নয়, এটা আমাদের পরিবারের মধ্যেই হতে পারে, আমাদের খুব কাছেই মানুষের জীবনে হতে পারে। ওরা ওই রকম, এই ভেবে আমরা যদি দূর করে দিই তবেই কিন্তু এই ভুল বোঝাবুঝিগুলো প্রকট হয়ে যায়। যদি আমরা এভাবে ভাবি যে আমাদের কাজের মানুষের ক্ষেত্রেও এরকম হতে পারে, তবে হয়ত এত সহজে আমরা বৈষম্য করতে পারব না। কোনও মানুষকে আমার নিজের মতো বুঝতে পারলেই যে তাকে মেনে নেব, সেটা কেন ... তাকে তো তার মতন করে বুঝতে হবে। আমি যেভাবে জগতটা চিনেছি, সেই খোপে তো সবাই নাও আসতে পারে। সেই সংবেদনশীলতা আসাটা খুব প্রয়োজনীয়।

শম্পা সেনগুপ্ত: অনেক ধন্যবাদ অনি। আজকে আমরা কথা বললাম রূপান্তরকামী মানুষদের জন্য যে আইন আসতে পারে, সে বিষয়। আমরা এই বিষয়ে পরেও অনেক প্রোগ্রাম করব। আমাদের মনে যে একটা খাপ তৈরী হয়ে আছে, সবাইকে সেই খাপে ঢুকতে হবে, সে ধারনাটা এবার আমাদের মাথা থেকে সরানো দরকার। সেটা যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ আমরা সব মানুষের অধিকার নিয়ে কাজ করতে পারব না। আপনাদের আজকের অনুষ্ঠান কি রকম লাগল জানানেন!

লেখিকা আইওয়া ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক ও প্রান্তিক লিঙ্গ ও যৌনতার মানুষদের আন্দোলনের গোষ্ঠী সদস্য

একলা চলো রে

আরও একবার হোক চলার শুরু - জীবন উদ্দেশ্যে

ছেঁড়া চটি আর শূণ্য হাতের সাথেই...

স্বপ্নের সাত রং গিলেছে - অসীম সমুদ্রের নোনা জল

বুকের ভিতরটা যতই ছিড়ে যাক

হৃদয়ার চরম আঘাত

তবু আরও একবার হোক

একলা চলোর ডাক।

যার পা নেই, সেও তো রাস্তা হাটে

সাঁতার কাটে - জীবন আনন্দে

কি বীভৎস সাহস ...

তাই আরও একবার নেওয়া যাক

আকাশ পানে - সময় থামিয়ে

শূণ্য জীবনের বুকি

শুনেছি শ্রাবণের কালো মেঘের আড়ালেই

রামধনু দেয় উকি।

কবি কোচবিহারে অবস্থিত

জয় বর্মন

নিঃশব্দ বিপ্লব

যখন -

বিষাক্ত স্মৃতি আচড় কাটে - ক্ষতবিক্ষত হৃৎপিণ্ড

ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া টুকরো টুকরো অতীত

চোখে দানাবাঁধে গভীর রাতের মুক্ত আকাশের

যুদ্ধ শেষের নিঃস্তবতায় তখনও দূরে কেঁদে চলেছে

গভীর রাতের বোবা অন্ধকারটা কণ্ঠ বাড়াতে সহায়ক

কখন যে ধীরে ধীরে মূর্ছা যায় পরাজিত দুটি চোখ

আর ভুবে যায় - অবাধ্য নোনাজলে।

তখন হঠাৎ

মেঘ ঘসে জ্বলে ওঠে এক ঢিলতে স্ফুলিঙ্গ

বাজে আবার জীবন যুদ্ধের দামামা

বর্ষা ভেজা চোখ শক্ত হয়ে ওঠে

বাস্তবের দাবানলে তখন মনটা ভস্ম

অকৃতজ্ঞ শিরাগুলি আবার জমাট বাধে

তখন শহরের প্রাণহীন বাইপাসে হাঁটা দেয় একটি মানুষ

- পাঁজড় ভাঙ্গা বুকে তার

আন্দোলিত।

হয়

নিঃশব্দ বিপ্লব

নিঃশব্দ বিপ্লব

নিঃশব্দ বিপ্লব

কবিতা

বিপ্লবী বীর | মোঃ জাহিদুল ইসলাম

পেটের ক্ষুধায় খাবার দেয়নি
 দিয়েছে জগতের অপবাদ,
 ক্ষুধার জ্বালায় দেহ বেচলেই
 মোল্লা বলেছে, পুরোহিত বলেছে
 বেশ্যারা কতল যোগ্য,
 বেশ্যারা মুরতাদ।
 রজঃশীলা বলে অপমান করেছে
 ভুলেছে নারীও যে মা আমার,
 কেমন হত এই বেশ্যা,
 মা হতো যদি তোমার?
 বেশ্যাকে মা বলতে
 যে পুরুষের নাক কাটা যায়,
 সেই পুরুষই গোপনে গোপনে
 বেশ্যার ভাত খায়।
 মোল্লা ব্রাহ্মনের পেটে
 খোঁজ নিলে মেলে বেশ্যার ভাত,
 ওরাই বলে নীতি কথা
 গেল গেল জাত আর পাত।
 সস্তা মেকাপ, মোটা কাপড়
 চির চেনা সেই গলি
 ওরা চির বিপ্লবী বীর
 ওরা জগতের মা
 এমন সত্য শির উঁচু করে বলি।

*কবি প্রাক্তন সহকারী অধিকর্তা
 ভল্যুন্টারি এ্যাকশন ফর সোসাইটি ও
 প্রতিষ্ঠতা সম্পাদক, বইমিতালি গ্রন্থনাগার
 ঢাকা, বাংলাদেশ*

হিজড়ার অন্ধপুত্র | সৈয়দ রিয়াজুর রশীদ

বর্ষা এসে চলে গেলেও জলবদ্ধতা আর প্যাচপ্যাচে কাদা এমনই গেড়ে বসেছে যে এখান থেকে পালাবার পথ নাই। অবস্থা গুরুতর। বর্ষায় যেমন নাকানি চুবানি খেয়েছে কিন্তু আসন্ন বসন্ত কোনও প্রত্যয় সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়।
 জলে নদীতে নাকানি চুবানি আর কুমিরের ভয় কাটে না, বরং দেয়, কাদা পানিতে ছয়লাপ আরেক মহড়া। কাদার মধ্যে যেন বারুদের তুর্য ঘাপটি মেরে আছে; বর্ষাজলে বাড়ন্ত গাছ-পালার জঙ্গল, তাতে ঢাকা পড়ে মুক্তিসেনার পদচ্ছাপ; জঙ্গলে লতায়-পাতায় পথ-প্রান্তরে মিশে আছে ফণা ও বিষ; মুক্তিবাজরা এই বুঝি ছোবল হানবে।
 এতদিন যারা পলায়ণপর, এবার তাদের মূর্তি ভয়ানক। জ্বলে উঠছে বারুদ- কাদামাখা বারুদ, রক্তের গন্ধ নিয়ে বাতাস যখন মাতাল, দাহ্য হয়ে জ্বলে বারুদের ঘন স্তর,: ঘিরে ফেলছে আগুন, ঘিরে ফেলবে উত্তাপময় সার্কাসের রিং; ভয় দেখাবে, পোড়াবে, মারবে, আন্তো সব যাবে চলে আগুনের ক্ষুধায়। তাই বুঝি বাঁচোয়া নাই, আর বুঝি ফেরা হবে না নিজ দেশে, হাজার মাইল দূরে; শূন্য বোধ হয়, বড় ক্ষুন্ন বোধ হয়- এই বুঝি তাদের শেষ দান।
 পুষ্পদ্যান এখন হতবাক। মৃত্যুর উদ্যানে সমর্পিত ও পথরুদ্ধ পাক সৈন্য সকল স্মরণ করতে পারে না, যখন আজান ধ্বনিত হতো প্রত্যহ, ওয়াক্তে-অয়াক্তে ঘাটিতে কিংবা ব্যাংকারে! তবু কতবার আল্লাহকে কল্পনায় অনুভব করেছে, চোখ বুজে নিমগ্ন হয়ে শুদ্ধি কামনা করছে অথচ কী আশ্চর্য নারীর উরু ও স্তন, খিলান ও গম্বুজের মত উপমিত হয়েছে বার বার, তাদের প্রত্যহে, বিসর্জনে ও জর্জরে।
 বাংলার মাটি ও বধ্যভূমির কাদা মিলে গিয়ে বিষদাঁত ভাঙার কঠিন বঙ্কল বৃক্ষ শোভিত করেছে।
 সেই দিন, সেই মৃত্যু, সেই যুদ্ধ আয় রে আয়
কাটুটু
 মরা সৈন্যদের লাশ প্লেনে করে পাঠানে হতো পশ্চিমে; মৃতের সংখ্যা বাড়তে থাকলে তা আর করা হচ্ছে না। দেশে মৃতদেহ উপচে উপস্থিত হলে সৈন্যদের পরিবারও চেনাজানাদের মধ্যে আতঙ্ক ঝাড়া দিয়ে উঠবে। জেনারেল গুলহাসান জানিয়ে দিল মৃতেরা পশ্চিমে ও পূর্বে সমান অপ্রয়োজনীয়।
 এক বোন চিঠি লিখলো । প্রাপক হলো, ভাইয়ের ৩১ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের কমান্ডিং অফিসার।

মানব সম্পদ | গৌতম ঘটক

সবাই ওদের মেয়েলি, হিজড়া, ছক্কা বলে,
 কেউ কেউ ওদের ভয় পায়।
 কেউ বা ভয় দেখায়
 জোর করে সন্তোগ করতে চায়।

কিন্তু ওদের মনের খবর ক’জন রাখে?
 পরিবারও ওদের বোঝা মনে করে -
 পরিবারে ওরা ব্রার্থ্য।
 ওরা নিজেদেরকে অপাংতেও, প্রান্তিক ভাবে।

কিন্তু ওরা যে আমাদেরই সন্তান,
 ওদেরকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করতে হবে।
 তাহলেই ওরা পাবে মুক্তির পথ -
 ওরা আমাদের দেশের সম্পদ,
 মানব সম্পদ।

কবি কোচবিহারের সরকারী দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের শিক্ষক

আর্জি | নবারুণা গাঙ্গুলী

ঈশ্বর দেয়নি আমাদের নারী বা পুরুষ বলে পরিচয় দেওয়ার অধিকার ... সমাজ দেয়নি তোমাদের সাথে বসবাসের অনুমতি। আর তোমরা? দেওনি ভালোবাসার পরশটুকু। আমাদের শরীর টুকুই যা দেখতে বলো মানুষের মতো। আমাদের যদি মানুষ বলেই ভাবতে, খুব কি ক্ষতি হতো? শুধু তোমাদের মতে, নিয়মে আমরা বাঁচতে চাইনি বলে ... সুস্থ ভাবে বাঁচার অধিকারটাও কেড়ে নিয়েছো সুকৌশলে। আহা ... না না!... অভিযোগ নেই কোনো, অভিমান তো মিটেই গেছে কবে ... আসলে জানতাম অভিমান আপনজন আর অভিযোগ মানুষেরা করে ... তবু আজও এমন নয়, সাহস করে বলে দেবো... চাইনা তোমাদের, চাইনা ভালোবাসা। জানো, খুব কষ্ট পেলেও আজ হৃদয় নিঙরে একফোটা কান্নাও আসেনা। অবাক হচ্ছো নাকি? সে কি। অটুহাস্যে কবেই উপরে তো নিয়েছো সেই হৃদয়। আমাদেরকে তোমরা আর মানুষ বলে ভাবতে পারলে কই। তবু আর্জি ছিলো তোমাদের এই অতি উন্নত বিচারশালায় ... আমরাও কিন্তু বাঁচতে চেয়েছিলাম, একটুখানি শুধুই একটুখানি ভালোবাসায়।

কবি কলকাতায় অবস্থিত

চিঠিতে লেখা হয়েছিল।

‘আপনি যখন করাচি ত্যাগ করেন তখন আমি আমার সুদর্শন ভাইটিকে আপনার হাতে তুলে দেই। তাকে যদি জীবিত ফিরিয়ে না আনতে পারেন তাহলে তার মৃতদেহটি আনতে ভুলবেন না।’

বোনটি জীবিত কিংবা মৃত ভাইটাকে দেখতে পেল না।

আহত সেনাদের সামরিক হাসপাতালে পাঠানে সম্ভব ছিল না। কে তাদের নিয়ে যাবে?

শহর-বন্দর থেকে বের হলে যে পথ, তা কন্টকিত ছিল মাইন পোঁতা মৃত্যু ফাঁদে। মৃত্যু ঘটলে সম্ভব ছিল না দু’হাজার মাইল দূরের দেশটায়।

কয়েক মাস তারা বিশ্রাম পায় নাই। পায়ে বুট আছে তো মোজা নাই, ক্যাম্প আছে কিন্তু শোবার আয়োজন নাই। মনে হচ্ছে, ফোঁশ ফোঁশ করে যাচ্ছে গুপ্ত ঘাতক! এই বুঝি হামলা হবে।

অতর্কিত আক্রমণ, প্রচুর গোলাগুলির মধ্যে নিজেদের আরও কুঁকড়ে ফেলতে।

কোনও অপারেশানে বের হওয়ার ঝুঁকি নিতে নারাজ সকলে। সৈন্যদের কাজ যুদ্ধটা ভুলে গেছে। এক তরফা মানুষ মারতে মারতে এখন আর আঘাত-পাল্টা আঘাত- সব কলকাঠি হারিয়ে ফেলেছে তারা।

বরং বন্দিদের ভেতরে ত্রাস জারী রাখতে, মানুষ মারতে; : নারীদের ভোগে-উপভোগে শরীর ও সজ্জা অধিক প্রস্তুত ছিল।

কাটুটু

ইয়াহিয়া: যদি ওই মেয়ে লোকটা মনে করে তার হুমকির সামনে আমি মাথা নত করবো তাহলে তিনি সম্পূর্ণ ভুল করেছে।

ইন্দিরা গান্ধি: ওই মেয়ে লোকটা! ও নিয়ে আমার মাথা ব্যাথা নাই। এতে ঐ ব্যক্তির মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে।

কাটুটু

গোলাম আজম, ইয়াহিয়া ও জেনারেলদের পথ বাৎলে দিলেন: পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ভারতের উপর আঘাত হানুন।

কাটুটু

এমন যে হবে, লাফিয়ে এসে যুদ্ধ যে একেবারে কাঁধের ওপর পড়বে! মুক্তিবাজরা

মারবে আর একে একে ভূত হয়ে যাবে; ভূত-ভবিষ্যত নিয়ে অস্থির বোধ করতে করতে কখন যেন চেতনা জাগ্রত হচ্ছে না,শিশু অবনতিশীল।

কাটটু

বাঙালি নারী পরিক্রমায় নামটি হয়ে গেছে তার ফাকারখান। নারী প্রবণতা এতটা তুঙ্গে তার যে; অস্ত্র পরিচালনা ও সৈনিকের ব্রত খাটালে সমাহিত। তো, ফাকার খানের মধ্যে জোয়ারের মত উন্মেজনা ভর করলে, চনমন শরীর মন ভাবলো, করা যাক কওমের সেবা। মারা যাক দু’ একটা কাফের এবার। প্রতিটি বীর্যের ফাঁটা উৎসর্গ করে সে কাফেরদের উদ্দেশ্যে। প্রতিদিন। আজ আরো তীব্র হয়ে উঠলো; সময় কী হাটি হাটি করে প্রান্তে এসে দাঁড়াচ্ছে? চালান এসেছে, তাতে যে কয়টা, সেকানে দু’ একটার দিকে টান খেয়ে গেছে সে; মন বলছে, বৈচিত্র্য নিহিত, যেমন চেনা সংলগ্নতার মধ্যে খানিকটা লংঘন আর কি।

কাটটু

পক্ষ-বিপক্ষ খোলাশা হয়ে গেল আর সেই সাথে বক্ষ ও নিম্নভাগ। আকাশের চেহারা দেখে পাতালের প্রস্থান চিহ্ন। বিভ্রম জাগে; নিজ দেহের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে কোথায় অরাজকতা? চেনা আকৃতির বিপরীতে অচেনা দেখা বিকৃত। অক্ষিকোটর থেকে গোলক বেরিয়ে আসলো যেন হতভম্ব অবস্থান তার গোলক ধাঁধায়।

বক্ষের পেলবতা যেমন আহ্বান করে, তেমনি পুরুষ চিহ্ন জিহ্বা বের করে ভেংচি কাঁটছে। নিরুপায় ট্যাংক ছিল, আক্রমণে বিদীর্ণ হয়ে তুবড়ে রয়েছে এই রূপে বিহুলতা ফাকার খানের করোটির ভেতরে প্রদক্ষিণ করছে। শত্রুকে গোলাবর্ষণের জন্য উদ্যত নল, যেখান থেকে আগুনের ফুলকি বেরুবে ঘূর্ণন করছিল, চলছিল, নিষ্কিপ্ত হচ্ছিল গোলা অকাতরে সহসা তা নিশ্চল হয়ে পাল্টা আঘাতের তাণ্ডবে উদ্যত নল স্থির থুবড়ে পড়ে আছে। এইভাবে বিধ্বস্ততার মধ্যদিয়ে এমনই নিশ্চল এক পরিত্যক্ত জটিল শরীর।

মনে হতে থাকে, যেন প্রলয়ের প্রশ্ন চিহ্ন বিস্ময়ের মধ্য দিয়ে নতজানু।

বিবর্তনের ধাপ পেরিয়ে উষ্ণরক্তের প্রাণী, লতাভাবে, একটা ঠাণ্ডা পানির কুয়ার ভেতরে নিজেকে ডোবাতে পারলে; তাতে আশ্রয় নিলে বর্ষণ কিংবা বপন কোনটা গ্রহণ করতে হবে না। কিন্তু দর্শন যেখানে হরণ সেখানে মরণ ছাড়া গতি নাই।

কাটটু

অন্য রকম একটা শরীরের মধ্যে এতদিন কাটাতে হয়েছে তাকে। ইচ্ছাটা শরীরসদৃশ নয়। হয় না, হয় না। নিজের ভেতরের শরীরটাকে বিশ্বাস হয় না; বাসনা-কামনা শরীরকে দুরন্ত করে ধাবমান এক অম্ব।

রুদ্র প্রলয়ের সাক্ষাতে বেদিশা মনে হয়! ভিতর থেকে উবে গেল প্রবণতা! সাক্ষাৎ এক দণ্ড তার জন্য উচ্চন্ড হয়ে জাহির করছে ! ছিঁড়ে ফেলবে, টুকরো করা হবে, নিজস্ব সত্তার মুখোমুখি কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে শেষ বধ্যভূমি তার জন্য।

কাটটু

মগা, মিনসে কিংবা ভেড়ুয়া বলে স্বল্প দীর্ঘতর এইসব উপধারায় এযাবতকালের পরিচয়ের দুয়ার সপাটে বন্ধ নারীর মতো অধিকারে যাবার বিপরীত সক্রিয়তা তাকে পরিচয় বদলের শিরোপা দিতে উদ্যত হলেও গোলাপের গায়ে কাঠখোদাই করার মেশিন হয়ে ওঠে অবিরত।

এই পরিচয়বোধ ছিল না কাম্য। পশুর চোখে নিজের ঠিকানা, মোহন মারার মতো অংকন , মুহূর্তে লতা ওরফে লতিফকে মিষ্টিসিজম হতে রোমান্টিসিজম, ভেদ করে ভোগ্যপি মনে হতে থাকে।

কাটটু

নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে জন্ম ও মৃত্যু তাদের সঙ্গী। ওরা মানসিকভাবে নারী। সমাজ জ্ঞাপন করে গেছে অস্বীকৃতি বরাবর। নারী হিসেবে মানতে।

কাটটু

নারীকামী ফাকার খান, তাকে নারী হিসেবে সম্ভোগে উদ্যত। হয়তো স্বীকৃতি মিলল নারীর মতো উপভোগ্যতার তোড়জোড় দেখে একটা পুলক শিরমির করে চমকে দেয় শরীরকে।

কাটটু

পুরুষাঙ্গ বিনষ্ট হয়েছে তাদের । না পুরুষ না নারী। পুরুষালিভাবে কম থাকলেও সংকট কটকিত পরিচয় হৈ হৈ করে ভেতরে প্রবাহিত হয়।

কাটটু

জেনানার দেহ ও মনে পুরুষ। ভালোবাসে নারীসাজ। পছন্দনীয় শরীরের কিছু সংখ্যক অঙ্গকে সর্বসম্মুখে প্রদর্শন। এভাবেই হয় তো সুখ কিংবা রাগমোচন।

বাহুমূল, রক্ষণযুগল, নাভি দেখাতে বেরোয়া হলেও সহসা আবিষ্কার করলো, কুঁকড়ে যাচ্ছে ! মানুষকে যা প্রদর্শনে অসম্ভব সুখ! সেখানে, এখানে নিরাভরণ নয় তুমুল নিবারণ।

নারী হয়ে ওঠার আকাঙ্খাটা মরে যায়।

কাটটু

গার্হস্থ্য বাড়ির সন্তান। সুন্দর সুঠাম দেহ তার। শরীরে যেমন আবছা গৌফরেখা, তেমনি উদগ্রীব স্তনও; চলন বলনে মেয়েলি। নারী হতে চায় দেহ প্রাণ। মনপ্রাণ আকুল হয়ে উঠলেও দৈত্যের আকাঙ্খায় নারী হওয়ার পূর্ণ সাধ নিকৃষ্টমানের স্বীকৃতিকে উপলক্ষ করে উদ্বেল হলেও যেন পরাজয়, যেন লিপ্সচ্ছেদনের যন্ত্রনা, যেন ইলেক্ট্রিকের ছেঁড়া তার জাপ্টে ধরে বৈদ্যুতিক ধাক্কা মেরে দুমড়ে দেয়ার আগে

বলে, মরে যা। মরে যায়।

কুকুরের খাদ্য মনিষ্যির পাতে যায় না বরং মনিষ্যির পাতের খাদ্য পরিত্যক্ত আশ্রিত হয় ভাগাড়ে, তাতে কুকুর, শেয়াল, দাঁত মুখ দেয়।

কাটটু

তাই তো! সে অনুভব করলো, কাক ময়ূর হয় না, হিজড়েও হয় না মা। নিজের পাপে, কোল ফাঁকা, অভিশাপ যে, কী করবে তা?

কাটটু

স্তনযুগল না থাকায় তোমাকে সহজেই আলিঙ্গন করা যায়। ঋতুশ্রাবের চিন্তা থাকে না বলে সুখের সাগরে ঢুকে থাকা যায়। গর্ভধারণের সম্ভবনা না থাকায় যৌবন ঢেউ খেলে শরীরময়।

কাটটু

সাম্প্রদায়িক খুনাখুনি, মানুষ মারা, স্বার্থের হানাহানি, মূল্যবোধের ভাঙচুর! এ রকম যা কিছু ঘটুক না কেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের ভেদাভেদহীন এক সম্প্রীতির সমাজ মানবের বদলে অবমানবদের দরবারে।

সহযোগিতা, সহানুভূতি, সহমর্মিতার বন্ধনে আবদ্ধ গড়ে ওঠেছে ধর্মীয় সহনশীলতা! কোনো বাড়িতে দেখা যাবে না সব ধর্মের অনুপস্থিতি। এখানে তাই।

কাটটু

লতা আটক হওয়ার পর অজস্র নারীর আর্তনাদে ভারী হয়ে ওঠা বাতাসে শ্বাস আটকে কম্পিত ও ভীতিময়।

কাটটু

আকৃতির মধ্যে বিকৃতি অথবা বিকৃতিকে শোভিত করেছে আকৃতি।

লতিফের ভোটাদিকার ছিল। লতার কোনো ভোটের বাক্সে ব্যালট ফেলার কোনও রকম নাই অধিকার। ছয়দফা লতিফ জানে, লতা জানে না।

নিজের ভেতরে লুকানো যে সত্ত্বা স্তব্ধ হয়ে থাকে সেখানে যে উচ্চারণই থাক, সেই ভাব প্রকাশ হয় নাই ব্যালট কাগজে, নৌকা মার্কায় ছাপ্লড় মারার দারুণ উল্লাসে।

সে মুজিবরকে ভোট দিতে পারে নাই। ভোট দেয়ার খাতায় নাম ছিল না তার। এই দেশের খাতায় নাম ওঠে নাই।

কত করেও পারে নাই, মুজিবরকে ভোট দিতে। নৌকার পালে হাওয়া লাগাতে।

চিৎকার করে উঠলো সে। এ কেমন তার অপরাধ।

কাটটু

সে অনুভব করলো, শিশু ও অণ্ডকোষ নাই, চ্ছেদন করা হয়েছে, শিশু না থাকলে, পৌনে এক ইঞ্চির মতো উঁচু শিশ্নের অবশিষ্টাংশ, অনুস্থিত লিঙ্গের মতো নরম নয়, শক্ত এই মাংসপিণ্ডের মাঝখানে থাকে মূত্রনালী ও ছিদ্র।

ঘর্ষিত হলে যেমন তা বিনা ঘষণে বরং এক ধরনের নিজস্ব গজর্নে মূত্রচ্ছিদ্র দিয়ে নির্গত হচ্ছে স্ত্রীরজ।

কাটটু

তার করোটির ভেতরে বিদুৎ খেলে যায়। চোখ যে দিকে ঘরে ছড়ানো ছিটানো হাতের চুড়ি ভাঙ্গা, ফিতা, স্যাভেল, রক্ত, রতি, চুল দেখতে দেখতে স্থির করে নিজেকে, এখন যে কর্তব্য উচিৎ।

সে কামজাগা কথা বলা শুরু করলো।

ভারী মজা ফাকার মানের।

প্যান্ট নেমে গেছে হাটুর নিচে।

ঝাঁপিয়ে শরীর মর্দন করতে লাগলো।

কাটটু

নিজের মতো করে ভোটাদিকার রহিত রাষ্ট্রের উচ্ছিষ্ট অব প্রাণটা নিজেকে উপুর করে দিল।

একবার যে পুরুষ পায়ুকামের স্বাদ পাবে, তার আর নারীর প্রতি আসক্তি থাকবে না।

তাই তো ফাকার খানকে থামাতে হবে।

কাটটু

এইভাবে লতার আরেক ধরনের যুদ্ধ।

কাটটু

মুখ দেখলে নাকি অযাত্রা হয়। শিখণ্ডীর অশুভ-মুখ দর্শনে ভীষ্মের যুদ্ধযাত্রা নিষ্ফল করে কৌরবদের পরাজয় সূচিত করেছিল।

পাণ্ডবদের যুদ্ধে অযাত্রা হয় নাই।

কাটটু

যদি যায় বিগড়ে

তাণ্ডব দেখায় হিজড়ে।

ভাঙতে পারে হিজড়া

সবার পাঁজরা।

হিজড়ার অন্ধ পুত্র

চন্দ্র দেখতে পায়।

লেখক বাংলাদেশে অবস্থিত

ইউটোপিয়া | চয়ন রায়

ধ্যাত, কাঁদবো নাকি? কাঁদছি? ছিঃ ছিঃ। চোখে জল-জল ভাব, মোবাইলের সম্মুখ ক্যামেরায় ধরা পরলো; বাঁ হাতের আঙুলগুলো দিয়ে মুছে ফেললাম। জন্মানোর পরেও নাকি ভেউ ভেউ করিনি - মা বলত এককালে। ম্যাক্সি পরা মায়ের সরু সরু হাতের আদর খেতাম, মিষ্টি গন্ধ পেতাম শরীর থেকে। কাজল পরিয়ে দিতে দিতে বলত মা। অনেক কথাই। একটিই ছেলে - মা ভাবত বড় হয়ে বিশ্বজয় করতে বেরাবে। আধিপত্য করবে। ‘আমার জন্য একটা সোনা বউ দিবি তো এনে থোকা? ভুলে যাবি না তো তখন আমায়?’ মায়ের নরম কালশিটে ভরা চোখদুটোর দিকে চেয়ে থাকত আমার বছর ছয়েকের চোখজোড়া। মায়ের কথা বুঝতাম না। খিলখিল করে হাসতাম। কাজল পরলে আমায় ছোটবেলায় ভাল লাগত, ছবিতে দেখেছি। এখনও ভাল লাগে, বেশ মোহময় দৃষ্টি সৃষ্টি হয় - নিতীন বলে, মণীশ বলত। তারপর চুষতে বলে, বলত। সর্বত্র সেম গল্প। শরীর। মন তুমি সমাধিস্থ হও।

এইট-বি থেকে বাসগুলো ছাড়ছে। রাস্তায় মাঝে জ্যাম। ইউনিভার্সিটি থেকে ছেলেরা মেয়েরা বের হচ্ছে। নীতিন চলে গেছে একটু আগে। ও চাইছিল না, আমিই জোর করে এনেছিলাম ডেকে। ওর চোখে আপত্তি, ওর চোখে ক্রোধ, ওর চোখে শূণ্যতা। ভালবাসার ছিটেফোঁটা নেই। ‘আমি’ নেই। ‘কি বলবে, বলো।’ আমি শেষ বারের মতোন দেখে নিছিলাম নিতীনকে। ওর ওই মোটা ঠোঁটদুটো, হালকা দাড়ি, ওর ওই গোফ, কপালের উপর লেপটে থাকা চুল, পুরুষালী হাসি বা, শত চেষ্টাতেও হাসি আসেনি। গতকাল অবধি গর্ব ছিল আমি সবাইকে হাসাতে পারি। আজ পুরোপুরি ফেল মেরে গেলাম। নিতীন নরম হল না।

মেট্রো ট্রেনের শেষ কামরায় আমাদের দেখা। তাও বছর খানেক হল। আমি জানতাম না আগে, ও-ই বলেছিল - মেট্রোর প্রথম আর শেষ কামরায় গে ছেলে, বুড়োরা ঘুরে বেড়ায়। ধরতে আসে। ওর চোখদুটো দেখেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছিলাম প্রথম দিন। ছুপা রুস্তম। কথা হল। নম্বর বিনিময়। যোগাযোগ। হোয়াটসঅ্যাপ। দেখা হওয়া। শরীর। তুফান। গল্প। প্রেম। গঙ্গার ঘাট। নৌকায় দুষ্টুমি। কখনো নন্দন চত্বর, আড্ডা, কবিতা আসর, ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। এখানে বলে রাখি, নিতীন ভাল কবিতা লেখে। থিয়েটার করে। উদাত্ত কণ্ঠে ডায়লগ বলে। জম্পেশ চুমু খায়। মন কেমন করে দেওয়া হাসি হাসে। বাসের ভীড়ে সাহসী আলিঙ্গন করতে পারে। মাঝ রাত্রে একটা ফোন - ‘কি করছ? ঘুমাচ্ছিলে বুঝি? কিংবা ‘এই আজ খুব মনখারাপ, একটা গান শোনাবি?’ বলতে ওর কোন দ্বিধা হয় না। আমিও এই এতগুলো দিন প্রেম খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে শেষে এতটা পরিমাণ সাহচর্য পেয়ে মাথা ঘুরে গেল। বাড়িকে জানিয়ে টানিয়ে বসলাম আরকি। এখানে বাড়ির খানিক পরিচয় দিই। বাড়িতে মা আছে। পিসি আছে। মাসি-মেসো কাছেই থাকে। এ‘বাড়িতে যাতায়াত ওদের খুব কম। মা বিধবা, পিসি অবিবাহিত। বাবার স্মৃতি নেইই প্রায়। আমার যখন এগারো বছর বয়স, একদিন রাত্রে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরে মাকে চূড়ান্ত মারধর করে এবং উন্মত্ত অবস্থায় ফের বেরিয়ে যায়। সিআইটি রোডের কাছে শরীরটা পাওয়া গিয়েছিল পরদিন ভোরে। ট্রাক বা ম্যাটাডোর পিষে গিয়েছিল। স্পট ডেড।

মা কিন্তু কাঁদেনি। পিসি একটু খানি। মেসোই তদারক করেছিল। পুরুষটি চলে গিয়েছে, গত হয়েছে - এরকম কোনো অনুভূতি নির্ঘাত মায়ের হয়নি সে সময়। মা বরং মুক্তি পেয়েছিল। কেউ না বুঝুক, আমি ঠিক খেয়াল করেছিলাম। সবার অলক্ষ্যে চাদরে ঢাকা বাবার শরীরটা দিকে তাকিয়ে ভুকভুক করে হাসছিল মা। মনে মনে। অবচেতনে। আমি বুঝেছিলাম।

এরপর এল অগাধ সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়া। কে দেবে চাকরী? বাবা যে কি করত, এখনো ঠিক জানি না আমি। মেলায় মেলায় ডেকরেশনের কাজ করত, আরো কি কি সব। সরকারী স্থায়ী বাবুটি ছিলেন না মোটেই। তাই মায়ের সমস্যা হয়েছিল। পেটে বিদ্যের দৌড় তো ওই উচ্চ মাধ্যমিক অবধি। তাও ইংলিশে ব্যাক। মামার বাড়ি শুনেছি খুব দামী ছিল। ছোটোবেলাটা ভাল কেটেছিল মায়ের, মাসির। মার তো পালিয়ে বিয়ে, বিয়েও নয়, আমি পেটে এসে যাওয়ার পর নমো নমো করে খানিক স্বীকৃতি। স্বাভাবিক দাদু-মামারা মেনে নেয়নি। এতগুলো বছর পরে সব হিসেব বদলে গেছে অবশ্য। মাসির বিয়ে হওয়ার পর মাসি রাখত যোগাযোগ। সেসব বাবা মারা যাওয়ার পরে পরেই। মেসোও খরচ খরচা দিত মাসে মাসে। বিশেষত আমার পড়ার খরচ। আমার বইগুলো খাতাগুলো কিনেটিনে দিত। কিন্তু কতই বা করবে একটা মানুষ? মেসোর সংসার আছে, সেই সংসার দুটো অবিবাহিত দিদি আছে, মা আছে, ভাই আছে, সর্বোপরি বউ আছে। মাসিকে যা হাতখরচ দিত সবটাই মায়ের হাতে তুলে দিত মাসি। চাল-ডাল-নুন তাতে উঠত বৈকি।

পিসি বিনোদিনী গার্লসে সামান্য স্টাফের একটা চাকরী করত। তাতে সামান্যই আসত ঘরে। সর্বক্ষণ খিটখিটে স্বভাবের জন্য কোনো পুরুষ ওকে নেয়নি। দেখতে ভাল ছিল না, রূপটান খুব একটা দিত না বলা চলে। পিসির নামটা বেশ সুন্দর - মিতুল। মা আর পিসির মধ্যে উত্তেজক ঝগড়া লেগেই থাকত প্রায়। এখন হয় একতরফা। মা বকে যায়। পিসি থাকে চুপচাপ। নিজের মনে গান গায়, মাঝেমাঝে হেসে ওঠে। আসলে পাগলামো। আসলে নিজের সীমাহীন জগতটাকে ছোটো করতে করতে মনমাফিক ইউটোপিক জগত তৈরি করে নেওয়া এবং তার মধ্যে বৃদ হয়ে যাওয়া। আসলে এর পেছনে গল্প আছে। বলি। বছর সাতেক আগে এক দোলপূর্ণিমার রাতে হাওড়া থেকে অটো করে ফিরছিল মিতুল। মাঝরাস্তায় অটোওয়ালা আর তার সঙ্গী দুজনের ইচ্ছে হয় একটু লীলা করার। নিজেদের হয়তবা কৃষ্ণ ভেবে বসেছিল। বড় বড় বীরপুঙ্গবের দল। আর কৃষ্ণ’দের যদি ইচ্ছে হয় মোচ্ছব করার তাহলে কাউকে না কাউকে রাখা হতেই হয়। প্রতিটি মেয়েই রাখা। সদ্য জন্মানো বাচ্চাও তাই। রেপড হয়েছিল। চোরা গলিপথে। অটোর যাত্রী সেজে বসে থাকা

নিরীহ কৃষ্ণরা সেই রাতে অসুরে পরিণত হয়েছিল। রাখার দু’চোখের ভয় তারা উপভোগ করেছিল। রাখার দু’চোখে জন্ম নেওয়া লজ্জা ক্রোধ ঘৃণা যন্ত্রণা সব সেইরাতে উপকরণ হয়েছিল আরও আরও লীলা করবার। আরো আরো পেশন করবার।

পরদিন খোঁজ পাওয়া যায়। রাতে বাড়ি ফেরেনি দেখে সকালেই থানায় গিয়ে ডায়েরী করা হয়। আমি তখন কতই বা! বছর তেরো। ভীতু কৌতুহলী চোখে সব ঘটনা পর্যায়ক্রমে বুঝতে থাকি। দেখতে থাকি। পিসির ঘর বন্দী থাকার দিনগুলো রাতগুলো অবগুষ্ঠিত কান্নাগুলো এখনো কখনো-কখনো আমায় ভাবিয়ে তোলে। দিন-রাত সব ছ্যার ছ্যার করে বহে গেছে, কেউ বিচারের আলো এনে আমাদের ঘরে পৌঁছিয়ে দেয়নি। প্রতিবেশীদের মুখরোচক আমরা তখন। কত প্রেম, কৌতুহল কত।

বাড়ি ফিরব? সোয়া পাঁচ সদ্য। বিকেলের নরম আলোয় নীলাভ আশপাশ, ভ্যার্সিটি চত্বর। গেটের কাছটায় জটলা। অল্পবয়সীদের মায়াময় হাহা হোহো হিহি। প্রেম প্রেম গন্ধ। পূজো আসছে যে। আর মাসখানেক বাকি। হঠাৎ রঙ্গন। নিপাট ভালবাবুটি দেখতে লাগছে। ক্রিম রঙের পাঞ্জাবী, আকাশী রঙের জিন্স। খুতনিতে গোফের ঝালর। আহ যা লাগছে না।

‘কি রে! এখানে? হঠাৎ?’

‘হুমম। এক বন্ধুর সঙ্গে ভাবলাম দেখা করে যাই। সে এদিকেই থাকে।’

‘বন্ধু! কিরকম? বিছানা?’ বাঁ চোখ টিপে বেহায়া হাসি হাসে রঙ্গন।

এই ধরনের হাসিগুলো কমন বড্ড। বেশির ভাগ ছুপা রুস্তম ছেলেদের চোখে ঠোঁটে এমন হাসি লুকিয়ে থাকে। রঙ্গনের সঙ্গে এককালে আমি ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম। গাজা, মদের নেশা ও-ই ধরিয়েছিল। উত্তাল জীবন ছিল তখন, বাধ না মানা মানসিকতার সূত্র ধরে কলকাতার অনেক অলিগলি চিনেছি, অনেক ধরনের মানুষ দেখেছি। অনেক রকম শরীর চিনেছি। রঙ্গনের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল না, এখন মনে হয় ওর আর আমার মধ্যে কিছুই ছিল না।

সিগারেট অফার করল। বললাম খাব না। রঙ্গন বেশ অবাক হল। এককালে সিগারেট ছাড়া দুটো মুহূর্ত কাটত না আমার। একঘেয়ে চোখদুটো দিয়ে ও আমায় দেখতে লাগল। গোলাপী রঙের টিলেঢালা কুর্তি পড়েছি, বুকের কাছটায় সূক্ষ্ণ কারুকাজ। আজকাল খুব একটা সাজি না। কসমেটিক্সের অন্ধকারে নিজেকে লুকিয়ে কতদূর যাব? তাই সাজি না। কিন্তু হলফ করে বলতে পারি, এই ছিমছাম ‘আমি’কেও আজ সকলের ভাল লাগছে। সকলের চোখে অন্তত পড়ছি আমি।

ভার্সিটিতে রঙ্গন এসেছিল ডোয়েকের ক্লাস করতে। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ। রঙ্গন কোনো মতে গ্রাজুয়েট হতে পেরেছে। আসলে ওর বাবা আছে এবং বাবার পয়সা আছে। তাই জীবনের বেশ কিছু বছর চূড়ান্ত মোচ্ছব করে এখন বোধহয় হেলতে দুলতে কেরিয়ার নিয়ে ভাবছে।

আমি: চলি রঙ্গন। বাই।

রঙ্গন: তোর কি তাড়া আছে? দুটো মিনিট দাঁড়া না।

আমি: কি হবে? আমাদের মধ্যে সব কথা ফুরিয়ে গেছে। এখন কেবল তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কোন কাজ নেই।

রঙ্গন: ও তাই? তুই জানিস, কৌশিক রাজু বিশিদের সঙ্গে আমার আর কোনো রকম যোগাযোগ নেই? ড্রাগের সেই ভয়ঙ্কর জগত থেকে বের হতে পেরেছি। জানিস, গত বছরের সবগুলো দিন রিহাবে কাটাতে হয়েছে আমায়?

আমি হাসি। এসব শুনে আমার হবোটা কি? রঙ্গন নামের কোনো পুরুষের অস্তিত্ব নেই আমার জীবনে। বলি, ‘ভালোই তো। এইবার বিয়ে করে ফেল।’

রঙ্গন: কোনো মতেই সম্ভব নয়। আমায় তোকে ভাল লাগে, তাদের মতোন ছেলেদের, কিন্তু কোনো মেয়ের সঙ্গে বিছানা শেয়ার করা! অসম্ভব।

চুপ করে থাকি। ব্যাস্ত ট্রাফিক এখন আরো ব্যাস্ত। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আমাদের মুখেচোখে খেলা করে যাচ্ছে হলদে গেরুয়া রঙ। যানবাহনের প্রদেয় রঙ। রঙ্গন বেশ গান গাইত। কোথাও শেখে নি, কিন্তু খোলা গলায় সুর ঠিক রেখে গাইতে পারত। একবার ওর সঙ্গে শান্তিনিকেতনে, আমি। সেটা ছিল শীতের মাস। সামনেই ক্রিসমাস। ওর এক বন্ধু ছিল, গ্রাফিক্স ডিজাইন করত বেশ। আমার মতোই, বটম। বিতান। ও-ও গেছিল সাথে ওর এক বন্ধুকে নিয়ে। খোয়াইয়ের ধারে, মন কেমন করা সন্ধ্যাবেলা রঙ্গন গেয়েছিল কিছু। মনে নেই। দৃশ্যগুলো মনে পড়েছে। শব্দগুলো শূণ্য।

ধ্যাত রঙ্গনের ঐ যেমো পাঞ্জাবী সহ্য হচ্ছে না। দু’দিনের না কাটা দাড়ি ক্রমশ দূরত্ব বাড়চ্ছে। আমার দেখা রঙ্গন এ নয়। সেই রঙ্গন সাহসী ছিল, পুরুষালী ছিল, তার মধ্যে রোমান্স ছিল, তার মধ্যে ছিটেফোঁটা হলেও ভালবাসাটা ছিল। আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা রঙ্গনের কাছে সেসব কিছুই নেই।

কিছু একটা মিথ্যা বলে রঙ্গনকে কাটিয়ে এলাম। মোড় পেরিয়ে সামনেই অটোর লাইন। উঠে পড়লাম। ‘দূরদর্শন’। পেছনে ঐ যে আমার মোহর রঙের স্মৃতি।

(২)

বাড়িটা অন্ধকার। বেল বাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমি এই সময়ে কখনো ফিরি না। কপি রাইটিংয়ের যে নূন্যতম চাকরীটা করি সেটা বিকেলেই শেষ হয়ে যায়। তারপর সময় কাটাই ঘুরে ঘুরে। আজ এর বাড়ি, কাল নন্দন চত্বর, নয়ত নিতীনের সঙ্গে অন্য কোথাও। এগারোটার আগে বাড়ি ফেরা মানা। নিঃসীম অসহায়তায় ডুবে থাকা এক

বাড়ি। মন খারাপের তিনখানা ঘর। রান্নাঘর, কলপাড়ে বিষাদ হেঁটে বেড়ায়। পিসি থাকে নিজের ঘরে নিজের মতো। বছর সাতেক আগেকার ট্রমাগুলো পিসির ম্যাক্সিতে, বিছানায় বালিশে। জানালায় জানালায় ও কাদের মুখ? মা সারাদিন নিজস্ব কর্ম নিয়ে ব্যস্ত। রান্না করতে করতেই বেলা যায়। শুচিবাই বাতিক আছে, তাই সব কাজেই সময় লাগে বেশি। কখনো পিসিকে শুনিye শুনিye বকবক, ইচ্ছাকৃত অশান্তি, যাতে জানান দেওয়া যায় নিজের অস্তিত্বটুকু। আমি কাছে থাকলেই অভিযোগ শুরু। যাবতীয় কথা মায়ের বলতেই হবে আর আমায় শুনতেই হবে। এই জন্য পারতপক্ষে বাড়ি মুখে হই না।

দরজা খুলল পিসি। রাস্তায় হ্যালোজেন আলো এসে থেমে গেছে চৌকাঠে। পিসি কিছু বলল না। আমি বারান্দা ধরে এগিয়ে গেলাম। রান্নাঘরের আলো জ্বলছে। মা ওখানে। কথা শুনতে পাচ্ছি, ‘কে আবার এল এই সময়। বললাম দরজাটা খুলে দিতে, তা তার ঘর ছেড়ে পা-ই বের হয় না।’

পিসি দরজা বন্ধ করে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে কৌতুহল। বললাম, ‘ভীষন টয়ার্ড লাগছে। গরম গরম চা খাওয়াও না।’

বারান্দার টিমটিমে আলোয় পিসির চোখগুলো নিষ্পাপ লাগছে বড়। এককালের কাঠখোঁট্টা ভাবটা ফিকে এখন। আমাদের সমাজের আলুখালু কিছু লোকলজ্জা একটা মানুষকে চিরতরে পঙ্গু করে দিল। সে আর কাজ পেল না, ঘরে হল বন্দী। সে কোনও মনের মানুষ পেল না। তার ইচ্ছেগুলো খুন হল।

‘দিচ্ছি।’ পিসি রামাঘরের দিকে এগোলো। মা এতক্ষণে আমার গলার আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। আমি নিজের ঘরে ঢুকলাম। ব্যাগটা রেখে ফ্রেশ হলাম। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখি আলমারির পাশের টেবিলে চায়ের কাপ রাখা। ধোয়া উঠছে। পাশে মেরি বিস্কুট। চায়ের সঙ্গে কয়েক ফোটা ভালোবাসা মিশে আছে, আছে কিছু স্নেহ। এ চায়ের স্বাদই আলাদা।

কতদিন হয়ে গেল সবাই একসঙ্গে ঘুরতে যাওয়া হয় না। সিনেমা দেখতে যাওয়া বা পিকনিক বা আত্মীয়ের বাড়ি - নাহ সেসবও নয়। নিজেকে স্বার্থপর লাগছে। মাসের শেষে টাকা দেওয়া ছাড়া আর কোনো রকম যোগাযোগই রাখিনি ওদের সঙ্গে, প্রায়। নিজেকে নিয়ে, বন্ধুদের নিয়ে, শরীর নিয়ে, নেশা নিয়ে বড্ড বেশি ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। ভুলেই গিয়েছিলাম আমার মা বলেও কেউ আছে। আমার মিতুল নামের একটা পিসি আছে। এবং ওরা ভাল নেই।

মা ঘরে ঢুকল। ‘আজ এত তাড়াতাড়ি এলি যে?’

মায়ের ম্যাক্সিট্রা ঘামে একাকার। মুখচোখ ক্লান্তি। আমি ভাল করে তাকলাম। চোখদুটো কি বলতে চায়? বছর চার-পাঁচ আগেও মা'র চোখে ঘুম আসত না আমি কি খাব না খাব ভেবে। প্রচুর অভাবের দিন গিয়েছে। অভাবে স্বভাবও নষ্ট হয়েছে। দিন গিয়েছে, দম আটকানো পরিবেশ ক্রমশ নিজে থেকে বিস্তার করেছে। আমি এর মাঝেও ভাল থাকতাম কেননা আমার কাছে বই ছিল। অনেক ধরনের সাহিত্যিকের লেখা পাঠ করে সময় কেটে যেত। রোজ নব নব আবিষ্কার। পাড়ার লাইব্রেরিতে মাস গেলে পাঁচ টাকার বিনিময় যত খুশি ইচ্ছে বই দেওয়া নেওয়া করা যেত। ছোটো থেকেই মেয়েলী চালচলনের জন্য লোকের খ্যাপামো দেখে বড় হয়েছি। নিজেকে গুটিয়ে নিতে শিখেছি, মনের মধ্যে হাজারো কাটাকাটি করতে শিখেছি। নিজেকে নিয়ে বিব্রত থাকার কাল সেসব। আমি কখনোই আর আমার বয়ঃসন্ধি ফেরত চাইনা। এমন কৈশোরকাল যেন কখনোই আর কারোর জীবনে না আসে।

জীবনের রাস্তায় ছুটতে গিয়ে বই পড়ার অবকাশ হারিয়ে ফেলতে হয়েছে। দু-দুপ চাপ করে হাতে কোনো ভাল বই নিয়ে মজে যাওয়ার দিনগুলো রাতগুলো ভাবলেই এখন সুস্থপ্ন বলে ভ্রম হয়। আগে খুব ‘দেশ’ কিনতাম। লুকিয়ে চুরিয়ে ‘উনিশ কুড়ি’, ‘আনন্দলোক’। ‘আনন্দলোক’ এর পিছন পাতায় কভোমের বিজ্ঞাপন থাকত। ওখানে ছাপা সুদেহী পুরুষেরা আমায় ক্ষণিকের তৃপ্তি জোগাত। অথবা ম্যাগাজিনের ভিতরের কোনো শার্টলেস আমেরিকান নায়ক। ‘দেশ’ প্রায় মুখস্থ করতাম। বইপত্রের বিজ্ঞাপনগুলোও। ‘দেশ’ লাইব্রেরিতে রাখত না। কিনতে হত। ক্লাস নইনে মণীশদা’র কাছে পড়তে যাওয়া শুরু করি, তারপর থেকে আর কিনতে হয় নি। কেননা মণীশদা ‘দেশ’ পড়ত। ওরকম আরও অনেক সাহিত্য পত্রিকাও। আমি ভরাট বিস্ময় নিয়ে মণীশদাকে দেখতাম। ওর শরীরটা, ওর গলার আওয়াজ, মাঝেমাঝেকার দুধুমিগুলো ভীষণ লোভনীয় ছিল। বুধবার সকালে বাড়ি ফাঁকা থাকত। কেবল মণীশদা আর আমি। এরকম এক বুধবার নিজেরটা বের করে চুষতে বলে। সেই জীবনের প্রথম স্বাদ নেওয়া যৌনদণ্ডটির। তখন থেকেই স্বপ্ন দেখা শুরু। প্রতিটি মুহূর্ত যে রঙচঙে করে দিতে পারত, যার একটা কথাতাই আমি সবকিছু করতে রাজী ছিলাম। সেই মণীশদার বাড়িতে এক রবিবার সকালে গিয়ে মনামীকে আবিষ্কার করলাম। মণীশের প্রেমিকা এবং ও বাড়িতে যাতায়াত আছে। মানে, সবাই জানে সম্পর্কটা। কেবল আমি জানতাম না।

‘বসো না।’ মাকে বললাম। মার মুখে উদ্বেগ। ‘তোর কি শরীর খারাপ। বল, তাহলে ওষুধ এনে দিচ্ছি।’ মায়ের বিহ্বলতা দেখে ভাল লাগছে বেশ। জলের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। বোধহয় পিসির ঘর থেকে। ‘মা বিড়বিড় করছে, ‘রোজ এই এক ব্যাপার। দিনের মধ্যে ছয় বার স্নান করা লাগে। আমার মধ্যে একটু খুতখুতানি বাতিক আছে মানছি, তা বলে এরকম।’ কোন্ কোন্ ময়লা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চায় পিসি? মল তো বাইরে নেই, রয়েছে নিজ অন্দরে। সেসব কে দূরীভূত করবে?

‘আচ্ছা আজ রাতে কি রান্না হবে?’ মা একটু অবাক চোখে তাকালো। ‘দুপুরে তো ডাল করেছিলাম, আলুভাজা আর পোস্তবাটা। রাতের ভাতটা বসাব একটু বাদে। তুই

কি খাবি বল। ‘হঠাৎ হচ্ছে হল একটু দুষ্টুমি করতে। বললাম, ‘কি খাব? যা চাইব, তাই পাব?’ আমার ভঙ্গি দেখে মায়ের হাসি পেল। ‘হ্যাঁ বল, এবার।’ ‘তাহলে দু গালে দু’খানা হামি দাও।’ বলেই খিলখিল করে হেসে উঠলাম। মা-ও হাসল। নিমেষেই পরিবেশ হালকা হয়ে গেল। মা হাসি চেপে বলল, ‘বুড়ো বয়সে ফাজলামো হচ্ছে?’

‘তাই তো। তুমি তো খুব বড়ি হয়ে গেছ।’ ফের একতাল হাসি। মা কাছে এগিয়ে এসে বলল, ‘তোর কি খুব মন খারাপ, সোনা? বল আমায়।’

মায়েদের বোধহয় ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়টা অলটাইম কার্যকর। ঠিক বুঝে গেল। বললাম: ‘হ্যাঁ একটু।’

‘কি হয়েছে আমায় বল।’

‘কিছু নয় তেমন। নিতীনের সঙ্গে খানিক বামেলা... ও কিছু না।’

নিতীনের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা মা জানে। নিতীন কখনো এ বাড়িতে আসেনি। আপত্তি করেনি, কেবল জানার পরে জানতে চেয়েছিল : ‘তোদের ভবিষ্যতটা কি?’ আমি হেসেছিলাম। উত্তর দিই নি। মা যা বোঝার বুঝে গিয়েছিল। মাস খানেক ধরেই আমার আর নিতীনের মাঝে কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। ওর বাড়িতে জানে ছেলে কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে। আমি জানতাম আমাদের ভবিতব্য কি। অধিকাংশ টপ বা বাইসেক্সুয়াল ছেলেরা যেটা করে নিতীনও সেটাই করত, একটা সময়ে সুস্থ ভাবে কোনো মেয়েকে বিয়ে করে জীবন গুছিয়ে নিয়ে বসত। নিতীনের সমাজকে প্রচন্দ ভয়। এমনিতে দেখায় নিজে কত লিবারল, স্বাধীনচেতা কিন্তু নিজের যৌন পরিচয় দিতে গিয়ে লজ্জায় চুরচুর। আমায় এমন ফেক পরিচয় পছন্দ নয়। আমার খোলা হাওয়া ভাল লাগে। নিজেকে সোজা সাপ্টা হিসেবে প্রকাশ করতেও। এই ভাল লাগাগুলোর সংজ্ঞা সমাজের তৈরি অভিধান খুঁজে পাওয়া যাবে না। এইসব ভাল লাগা অনেক বেশি ছকভাঙা, বাঁকাচোরা, ঠোঁটকাটা। এইসব ভাল লাগা তাই সমাজ একসেন্ট করে না।

‘বুঝছি। আমার খুকুটার আজ মন ভাল নেই।’ মা আমার মাথার চুলগুলো ঘেটে দিল। ফুরফুরে চুলগুলো এলোমেলো হয়ে গেল। মা পাশে বসল। হঠাৎ ইচ্ছে হল মায়ের কোলে মাথা রাখি। কিন্তু রাখি বললেই রাখা যায় না। একপ্রকার বাঁধা কাজ করছে। মায়ের প্রশান্ত মুখ এখন। মুখের বলিরেখাগুলোয় নির্ভরশীল ছোটো ছোটো আশ্বাস ঘুরে বেরাচ্ছে। মায়ের বাম হাত আমাকে ছুঁল। আস্তে করে দৃঢ়তা নিয়ে বলল, ‘কিছু ভাবিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে।’

আমরা না চাইতেই অনেক কিছু পেয়ে যাই। পাওয়ার পর আরো বেশি করে পেতে চাই। অফুরান সুখ যৌনতা আনন্দের গন্ধ নিতে নিতে দিন প্রতিদিন চাহিদাগুলো আমার বেড়েই যাচ্ছিল। ছোট ছোট দামী মুহূর্তরা সব হাতছাড়া হচ্ছিল। এখন হচ্ছে হচ্ছে, বইপত্রের স্তুপ থেকে পছন্দের বইগুলো ফের বিছানায় নিয়ে আসতে। ধুলো মাখতে। নতুন করে নানান রকম পত্রিকা কিনতে। মাস শেষের মাইনে নিয়ে বইপাড়া যেতে। অথবা রান্নার কাজে মাকে সাহায্য করতে। পিসির ওষুধটা, মায়ের বাজারটা, বাড়ির ইলেকট্রিক বিলটা না হয় এর পর থেকে আমি দিয়ে আসব নিয়ে আসব। কাছের সিনেমা হলে ভাল ছবি আসলে এরপর থেকে ওদেরকেও নিয়ে যাব। ফেরবার পথে ছোটো মধ্যবিত্ত দোকান থেকে বিরিয়ানি, নয়ত বা চিকেন রোল কিনে বাড়ি ফেরা। খানিকটা হাসি খানিকটা স্বস্তি খানিকটা সুখ জড়িয়ে থাকবে সেইসব পল-অনুপলে।

নাহ, সব কিছু বদলে যাওয়ার আগে আরো একবার না হয় জীবনটাকে নিয়ে খেলা করা যাক।

লেখক ইতিহাস অনাসের প্রথম বর্ষে পাঠরত। সাহিত্যপ্রেমী

সংকলন ও সম্পাদনা অরিন্দম দাস (ওরফে সুমি)

সহযোগী সম্পাদনা ও বিন্যাস অনিন্দ্য হাজরা

মুদ্রণ সহায়তা প্রত্যয় জেভার ট্রাস্টি

ব্যক্তিগত বিতরণের জন্য

যোগাযোগ ৮৯২৭৩১৯৫২৯ / moitribarta@gmail.com

মৈত্রী সংযোগ সোসাইটি, কোচবিহার দ্বারা অরিন্দম দাস'এর

পক্ষ থেকে প্রকাশিত ও ইম্প্রেশন, কলকাতা থেকে মুদ্রিত